ভিতর দুয়ার

সুবোধ ঘোষ

শুধু এক আবু পাহাড়েই ওদের সঙ্গে কমলেশের কতবার দেখা হলো! তিন দিনের মধ্যে পাঁচবার। শুধু চোখের দেখা, এবং দেখে কিছুই বোঝা যায় না, ওরা সত্যিই এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও তাঁর মেয়ে কিনা?

পাঁচবার দেখা হলেও কমলেশের সঙ্গে ওদের একটি কথারও বিনিময় ঘটেনি। গায়ে পড়ে আলাপ করলে অবশ্যই জানতে পারা যেত। কিন্তু কোন অচেনা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি তরুণী মেয়ে থাকে, বিশেষ করে সে মেয়ে যদি দেখতে বেশ সুন্দর হয়, তবে তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ না করতে যাওয়াই ভাল। ভদ্রলোক হয় তো শুকনো স্বরে কাটা-কাটা কয়েকটা কথা বলে বাধিত করবেন এবং তরুণী মহাশয়া আরও শুকনো একটি ভ্রূভঙ্গী করে সেই গায়ে-পড়া আলাপের চেষ্টাকে একটু সন্দেহ করবেন, কিংবা করুণা করবেন। এ ধরনের যেচে আলাপ করবার কোন বাতিক কমলেশের নেই। এটা একটা ঠেকে-শেখা সাবধানতাও বটে। সত্যিই, একবার জব্বলপুরের মার্বেল রক দেখতে গিয়ে নর্মদার জল-প্রপাতের কাছে সুন্দর একটি পাথুরে নিরিবিলির মধ্যে এক বাঙ্গালী দম্পতিকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে গিয়েছিল আর যেচে আলাপ করেছিল কমলেশ—আপনারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালী।

দম্পতির দু'জোড়া চোখে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। স্বামী ভদ্রলোক বাংলা ভাষাতেই উত্তর দিলেন—বাঙ্গালী হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি?

অপ্রস্তুত হয়ে সেই মুহূর্তে সরে গিয়েছিল কমলেশ। আর, সেই বাঙ্গালী হলে বা কি আর না হলেই বা কি, সেই দম্পতি নর্মদার ধারে পাথুরে নিরিবিলির মধ্যে সেই আদম-ইভ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

কিন্তু ওরা, যাদের এই তিন দিনের মধ্যে পাঁচবার দেখেছে কমলেশ, ওরা হলো বাপ আর মেয়ে। যদি তা না হয় তবে নিশ্চয়ই পিতৃতুল্য আর কন্যাতুল্য দুটি মানুষ। এটুকু দেখেই বোঝা যায়।

যাই হোক, যদি একবারও ওদের কথা শুনতে পাওয়া যেত, আর কমলেশ বুঝতে পারতো যে, ওরা সত্যিই বাঙ্গালী, তবে না হয় একবার সব কুণ্ঠার মাথা খেয়ে, কাছে এগিয়ে গিয়ে আর যেচে আলাপ করা যেত। এমনও হতে পারে তো, যদি ওরা বাঙ্গালী হয় তবে কমলেশের সঙ্গে ওদের একটা আত্মীয়তার সম্পর্কও কথায় কথায় হঠাৎ ধরা পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু ওরা বড় ব্যস্ত। তিন দিনের মধ্যে কমলেশের সঙ্গে পাঁচবার ওদের দেখা হলো, তবুও বাপ বা মেয়ের চোখে কোন কৌতূহলের এক বিন্দু চঞ্চলতাও ফুটে উঠেছে কিনা সন্দেহ। আবু বাজারের ভীলের ভিড়ের কোন মুখকে যেমন বেশিক্ষণ চিনে রাখা সম্ভব হয় না, তেমনি কমলেশকেও দেখে ওরা বোধ হয় বুঝতেই পারে না যে, এই মানুষটার সঙ্গে ওদের এই নিয়ে কতবার দেখা হলো।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সাজ হলো, গলাবন্ধ একটি লম্বা কোট আর ট্রাউজার। তরুণীর সাজ, নতুন অশথ পাতার মত রং-এর রেশমী শাড়ি, আর অপরাজিতার রঙের মত নীলঘন ব্লাউজ। আবু পাহাড়ের আলো তখনো ফুরিয়ে যায়নি, দিলবরা মন্দিরে ঢুকেই দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল কমলেশ, শ্বেতপাথরের থামের গায়ে হেলান দিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী, অমল-ধবল পাষাণের গায়ে যেন রঙান ফুলের একটি গুচ্ছ হেলে পড়ে রয়েছে। দিলবরার সেই স্তবকিত মর্মরের কারুশোভা একেই তো জাদুময় সাদার কমনীয় স্বপ্ন, তার উপর যদি নতুন অশথ পাতার মত ঐ রঙ এসে একটি জায়গায় ফুটে থাকে···সত্যিই দিলবরার সাদা পাথরের জাদুকে আরও নিবিড় করে দিয়েছে ঐ তরুণী।

সূর্য যখন ডুবেছে, তখন আর একবার দেখতে পায় কমলেশ, নক্কি তালাও-এর ছলছল জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো পিতা-পুত্রীর দুই মূর্তি। মেয়ের মনে সাধ হয়েছে বোধ হয়, আর বাপও রাজি হয়েছে; বোটে চড়ে সন্ধ্যার প্রথম জোৎস্নার সঙ্গে হেসে হেসে আর বোটের সঙ্গে দুলে দুলে নক্কি তালাও-এর শোভা দেখবে মেয়ে। হয়তো কবিতা লেখে, কিংবা ছবি আঁকে এই তরুণী। হাতে এখন অবশ্য শুধু একটা ক্যামেরা ঝুলছে দেখা যায়।

কমলেশকে পাশ কাটিয়ে ওরা হেঁটে চলে গেল। কমলেশের সঙ্গে চোখের দেখা-দেখিও হলো। কিন্তু কমলেশের মুখটাকে দ্বিতীয়বার দেখে একটু আশ্চর্য হবারও যেন সময় নেই তরুণীর; ওর চোখের পিপাসা যে তখন ভয়ানক ব্যস্ত। নক্কি তালাও-এর জল তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ওদের ব্যস্ততা দেখে বোঝা যায়, ওরা এই আবু পাহাড়ের মানুষ নয়। কমলেশের মত ওরা বেড়াতে এসেছে; কিন্তু কে জানে কোথা থেকে এসেছে, আর কোথায় চলে যাবে?

বনপথের ছায়ায় ছায়ায় সানসেট পয়েণ্ট যাবার সময় কমলেশের একবার মনে হয়েছিল, আবু পাহাড়ের মায়া কাটিয়ে কালই বোধ হয় চলে গিয়েছে সেই নতুন অশথ পাতা রঙের শাড়ি। কিন্তু কি আশ্চর্য, পয়েণ্টে পৌঁছেই দেখতে পায়, পাথর-কাটা আসনের উপর আরাম করে বসে সূর্যাস্ত দেখবার জন্য পশ্চিমের আকাশের দিকে

দুটি উৎসুক চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সেই তরুণী। হাতের কাছে একটা খোলা ব্যাগ, হাতের পাশে ছড়িয়ে আছে ছবি আঁকবার নানা সরঞ্জাম। যাক্, আপাতত এইটুকু বোঝা গেল যে, ছবি আঁকবার বাতিক আছে মেয়ের, বাপও তাই বোধ হয় মেয়েকে আকাশের রূপ দেখাতে নিয়ে এসেছে।

পরের দিন ক্র্যাগ্‌স। ভাবতেই পারেনি কমলেশ, এতদূর পাহাড়ী খাড়াই পার হয়ে ঐ নরম রঙীন চেহারার মেয়ে এখানেও এসে বসে থাকবে। অদ্ভুত এই জায়গাটা। ভূতলের একটা টুকরো যেন হঠাৎ ক্ষেপামির আবেগে চার হাজার ফুট উপরে উঠে এসে নিরেট ও নিথর হয়ে গিয়েছে। সবুজ পাতার ঝোপঝাপ ঠেলে প্রকাণ্ডদেহ এক একটা পাথরের দানব যত উদ্ভট রকমের থোঁতা-ভোঁতা চেহারা নিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে রয়েছে। সামনে তাকালে নীচের ঐ ভূতলকে রসাতল বলে মনে হয়। এ এক অদ্ভুত রূপ! কখনো মনে হয়, ভয়াল বুঝি সুন্দর হয়েছে। কখনো মনে হয়, সুন্দরই ভয়াল হয়ে উঠেছে। আর্টিষ্ট মেয়ের চোখ দুটো যেন চমকে ওঠা তপস্বিনীর চোখের মত। ওর চোখে চমক লেগেছে, দেখতে ভাল লাগছে সামনের ঐ সুন্দর-ভয়াল রূপ। কিন্তু বুঝতে পারে না বোধ হয়; ওকেও আজ এখানে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। কমলেশ নামে একজন অচেনা লোকের চোখেও কত ভাল লাগছে।

পরের দিন অচলগড় যাবার সময় পথে একবার দেখা হয়েছিল। ওরা অচলগড় থেকে ফিরে আসছে। কমলেশ যাচ্ছে। ট্যাক্সির চাকা অনেক ধূলো উড়িয়ে চলে গেলেও দেখতে পাওয়া যায়, ট্যাক্সির ভিতর পিতা-পুত্রী বসে আছে।

অচলগড়ের পাঁচ ঘণ্টা সময় মন্দির আর দুর্গ দেখে পার করে দিলেও, কমলেশ যেন সেই দেখার আনন্দকে মনে ভরে নিতে বার বার ভুলে যায়। চেনা নয়, শুধু বারকয়েক চোখে দেখা একটা

মুখ; তবু বার বার কমলেশের মনে হয়, অচলগড় থেকে ফিরে গিয়ে আবার আবু পাহাড়ের কোন আনাচে কানাচে, কোন মন্দিরের ধারে বা থামের কাছে সেই মেয়েকে কি আর দেখতে পাওয়া যাবে?

দেখতে পায়নি কমলেশ। কোন্ সময়ে ওরা চলে গেল, তারই বা খোঁজ দেবে কে? খোঁজ নিয়েই বা লাভ কি? ওদের পিছু পিছু ছুটে বেড়াবার জন্য কোন শপথ আর প্রোগ্রাম নিয়ে বের হয়নি কমলেশ। একটানা পাঁচ বছর ধরে শুধু মেশিনের মন মতলব ও চেহারা, আর কল-কব্জার যত আধি-ব্যাধি নাড়া-চাড়া করতে করতে জীবনটাই যে একটা একঘেয়েমির যন্তর-মন্তর হয়ে উঠতে চলছে। তাই একটু হাঁপ ছাড়বার জন্য, মাটিতে আর আকাশে ছড়ানো যত মায়া ছন্দ আর রঙের চেহারা দেখে চোখের স্বাদ একটু বদলে নেবার জন্য বেড়াতে বের হয়েছে কমলেশ। তিন মাসের ছুটি।

আবু রোড স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠবার সময় আর একবার কমলেশের মনে হয়েছিল, সেই পিতা-পুত্রীও কি বেড়াতে বের হয়েছে? ভাবতে গিয়ে কমলেশের মনের একটা গর্ব যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ ফেরায়। চোখের এত লোভ এতদিন ধরে লুকিয়ে ছিল কোথায়? সুন্দর মুখ দেখতে কারও চোখে খারাপ লাগে না ঠিকই; কিন্তু বিশেষ একটি সুন্দর মুখকে আর-একবার দেখবার জন্য চোখ দুটোকে যদি এত বেশি তেষ্টায় পেয়ে বসে, তবে তো বুঝতেই হবে যে মনটাই চোখের কাছে হার মানতে বসেছে।

মনেরে না বুঝাইয়ে নয়নেরে দোষো কেন? না, কথাটা ঠিক নয় বোধ হয়। বরং বলা উচিত নয়নেরে না বুঝাইয়ে মনেরে দোষো কেন? কমলেশের মন আর-একবার একটা চোখের দেখা দেখতে চায়। এই মাত্র।

ইন্দোরের এক সন্ধ্যায় ছত্রীবাগের কাছে লোকের ভিড়ের ভিতর থেকে বাংলা ভাষার একটা কলবর হঠাৎ শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিল কমলেশ, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা গেল না, কে বললো কথাটা, কাকে বললো, এবং কোন দিকে চলে গেল। চারদিকের যত ইখড়ে-তিখড়ের মধ্যে মেয়েলী গলার মিষ্টি স্বরে ভেজানো বাংলা ভাষার এক টুকরো কলরব—এখানে আর দেরি ক'রে লাভ নেই বাবা।

ইন্দোরের সেই সন্ধ্যায় ছত্রীবাগের ভিড় আর আলো-ছায়ার কাছে আর দেরি করতে চাইছে না কে? সে নয় তো? দু'দিন পরেই দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল কমলেশ, তার বাইনকুলারের কাঁচে নতুন অশথ পাতার রঙ হেসে উঠেছে।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বাইনকুলার চোখের কাছে তুলে অনেকক্ষণ ধরে দূরের বাগনি নদীর বালি আর পাথরের বুকে আঁকা-বাঁকা ক্ষীণ স্রোতের জলের খেলা দেখেছে কমলেশ। তারপর বাইনকুলার ঘুরিয়ে বাঘ গুহার বড় চৈত্যগৃহের দিকে তাকাতেই চমকে ওঠে কমলেশের হাতের বাইনকুলার। যক্ষরাজের ঐ বিরাট মূর্তির ছায়ার কাছ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে সেই তরুণী। যাচ্ছে গুহার দিকে, যে গুহার বুকের ভিতরে শান্ত নিভৃতে দেড় হাজার বছর আগের মানুষের চোখের সাধ যেন তুলি ধরে রঙীন মায়া এঁকে রেখে গিয়েছে। ফিরে আর গুহার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে নি কমলেশ। একটা সুন্দর মুখের মেয়েকে দেখবার জন্য লোভী চোখ নিয়ে চিতে বাঘের মত ওৎ পেতে গুহার থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে মনটাই যে লজ্জা পায়। এখানে আর দেরি করেনি কমলেশ।

কিন্তু দেরি করতে হয়েছিল উজ্জয়িনীর রেল ষ্টেশনে। ট্রেন আসবার সময় হয়নি। প্লাটফর্মের উপর পায়চারা করতে করতে

একবার একটু থমকে দাঁড়াতেও হয়েছিল। কি আশ্চর্য, ওয়েটিং রুমের দরজার কাছে সেই তরুণীই যে দাঁড়িয়ে আছে! কমলেশকে দেখতে পেয়ে তরুণীর চোখ দুটো আশ্চর্য হলো কিনা বোঝা গেল না। বরং, মনে হয় কমলেশের, একটা সন্দেহের ছায়া যেন চমকে উঠে সেই মেয়ের চোখে ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

কমলেশের চোখ দুটোও বিরক্ত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। তরুণী মহাশয়া বোধ হয় ভাবলেন যে, একটা লোক পাষাণী-আমি-তব-ধাইব পশ্চাতে গোছের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারে না কেন, বাঘ গুহাতে কমলেশই একদিন আগে এসে পৌঁছেছে, ওরাই এল পরের দিন। কিন্তু কমলেশ তো এই মিথ্যা সন্দেহ দিয়ে চোখে ভ্রূকুটি পাকিয়ে তুলতে পারে না যে, উনিই কমলেশের মুখ দেখবার জন্য পিছু পিছু ধাওয়া করে ছুটছেন।

উজ্জয়িনীতে এসে তরুণীর শাড়ির রঙটাও বদলে গিয়েছে। রেবার ঘোলা জলের গাঢ় গৈরিকের সঙ্গে সবুজের আবছায়া যেমন মিশে আছে, তেমনি মিশালী রং-এর বাহার নিয়ে ফুরফুর করছে তরুণীর শাড়ির আঁচল।

তার পরের কয়েকটা দিন বিনা চমকেই কেটে গেল। কমলেশের দুটো দিন সওগারে এসে ডিজেল ইঞ্জিনের কলকব্জা মেরামতীর একটা নতুন কারখানা দেখতেই কেটে গেল। তারপর দুটি দিনের পর এক অদ্ভুত স্নিগ্ধ ও শান্ত দুপুরে, বিচিত্র আবেশে আনমনা হয়ে যাওয়ার একটি মুহূর্তে, নিজের ছায়ার পাশেই রঙীন শাড়ির ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো কমলেশ। সেই তরুণী; প্রৌঢ় ভদ্রলোক এখন বোধহয় খজুরাহোর এই মন্দিরময় বিস্ময়ের জগতে অন্য কোথাও অন্য কোন মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আর, এই

তরুণী একা একা নিজের চোখের টানে চলতে চলতে এমন এক মূর্তির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ওর পক্ষে শুধু একা একাই দাঁড়িয়ে সেই মূর্তিকে দেখে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তরুণী যদি না চলে যায়, তবে কমলেশেরই চলে যাওয়া উচিত।

চৌষট যোগিনী মন্দিরের আঙ্গিনায় পুরনো পাথরের কত অভিমানের মায়া ছড়িয়ে আছে ; এদিকে-ওদিকে কত মকর-বাহিনী গঙ্গা, বরাহ, নন্দী, ব্রহ্মা আর রামচন্দ্র পড়ে আছেন। এই মেয়ে সেখানে গেলেই তো পারে। কন্দর্য মহাদেবের মন্দিরতোরণে এই মিথুন মূর্তির কাছে এসে ঐ পাথুরে আলিঙ্গনের ভয়ানক নির্লজ্জ ভঙ্গীটিকে না দেখলেই কি নয় ?

আশ্চর্য হয়ে গেল কমলেশ ! এই মেয়েও যে নিবিড় এক ভঙ্গী ধরে, পাথরের মত নিথর হয়ে, মিথুনের দুই প্রগল্ভ মুখের হাসি আর চোখ-ভরা আবেগের সেই স্তব্ধীভূত উচ্ছলতার রূপ দেখছে ? ওর পাশেই যে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, কমলেশের মত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পুরুষ, সেই বোধ আর হুঁসও যেন ওর নেই।

আনমনা হয়ে, বোধ হয় মুগ্ধ হয়ে, মিথুন মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে তরুণী। কমলেশের চোখের আবেশও যেন সব লজ্জার ভয় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তরুণীর ঐ দ্বিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়িয়ে-থাকা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া দেহের ছাঁদও এমন সুন্দর হয় ! তরুণী নিজে আর্টিষ্ট, কিন্তু ওর শরীরটাই যে একটা আর্ট ! এই সত্য কি কখনো উপলব্ধি করতে পেরেছে এই মেয়ে ? নইলে ভুলে যায় কেমন করে, ওর পক্ষে এই নিভৃতে কোন পুরুষের চোখের এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয় ? এই নিভৃতের শান্ত বাতাস হঠাৎ উতলা হয়ে যেতে পারে। আর মানুষের রক্ত-মাংসের আশা হঠাৎ-ভুলে পাগল হয়েও

যেতে পারে। অজানা ও অচেনা দুই জীবন্ত নারী-পুরুষের সেই ভুলের লীলা দেখে পাথরের মিথুন হেসে ফেলতেও পারে।

তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য কমলেশ তৈরী হয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েই দেখতে পায়; চলে গেল তরুণী। যাবার সময় কমলেশের দিকে ছোট একটি ভ্রূক্ষেপ করেই চলে গেল। কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ নিতান্তই ভ্রূক্ষেপ। সে মেয়ের চোখে কোন বিড়ম্বনার লজ্জা নেই, সোজা একটা সাদা-মাটা চাহনি মাত্র। যেন একটা প্রাণহীন পাথুরে যক্ষের দিকে তাকিয়ে, আর একটুও আশ্চর্য না হয়ে চলে গেল তরুণী।

ছুটিতে ঘুরে বেড়াবার আনন্দটাই যে একটা শাস্তি হয়ে উঠলো। চোখে-দেখার এক একটা আকস্মিক ঘটনা অকারণে কোথা থেকে এসে মনের ভাবনাগুলিকে বার বার বার খুঁচিয়ে বিরক্ত করে, কখনো বা ঠাট্টা করে চলে যাচ্ছে। বেড়াতে বের হয়ে এ যে একটা আলেয়ার পাল্লায় পড়তে হলো।

আবার একবার। সারনাথের পথে ফিরে আসছে কমলেশ; আর পিতা-পুত্রীতে টাঙ্গায় চড়ে বুড়ো ধামেক স্তূপের জীর্ণ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গল্প করতে করতে চলেছে। কমলেশের টাঙ্গা ওদের টাঙ্গাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই এইবার স্পষ্ট করে শুনতে পায় কমলেশ, আর শুনেই মনের ভিতর একটা স্বস্তির হাসি খুশি হয়ে চমকে ওঠে। ওরা বাংলা ভাষাতেই কথা বলতে বলতে চলে গেল।

কিন্তু, কিসের স্বস্তি আর কিসের খুশি? ওরা বাঙ্গালী হলেই বা কি আর না হলেই কি? ওদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য কি কমলেশের মনে এতদিন ধরে সত্যিই একটা গোপন তৃষ্ণা ছটফট করছিল? এটা তবে কি সব কুণ্ঠার মাথা খেয়ে একেবারে গায়ে-পড়ে আলাপ করবার আগ্রহ?

কিন্তু বৃথা। এই আশাটাই যে একটা আত্মবঞ্চনার মোহ। নিতান্ত অনর্থকের জন্য মনের একটা লোভের হয়রানি মাত্র। আবার সুযোগ পাওয়া যাবেই, দৈবের কাছে এমন কোন নিয়ম আশা করা যায় না।

তার চেয়ে ভাল, মীরাটেই ফিরে যাওয়া। তিন মাসের ছুটির মধ্যে একমাস তো একটা আলেয়া দেখার গোলমালেই কেটে গেল। দার্জিলিং-এ গিয়ে কাকার বাড়িতে একটা মাস কাটিয়ে আসবার ইচ্ছাটাকেও আর ভাল লাগে না। যাক্, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ধ্যানী তুষারের সাদাতে দুপুরের সোনালী আলোর খেলা না হয় আসছে বছর গিয়ে দেখে আসা যাবে। বাকি দু'মাসের ছুটি এখন হাতে রেখে দেওয়াই ভাল। আসছে বছর বেশ নির্বিঘ্নে বেড়ানো যাবে।

বেনারসের হোটেলে একটি ঘরের নিভৃতে বসে কমলেশের মনে হয়, এই একটা মাস ধরে ঘুরে-বেড়ানো জীবনে শুধু একটা ক্লান্তি ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। চোখ দুটো শুধু অকারণে আশা করেছে আর হাঁপিয়েছে। আবু পাহাড়ের সানসেট পয়েণ্ট আর ক্র্যাগস্, আর বাঘ গুহার চার নম্বর রঙ-মহল, সবই যেন কমলেশের চোখের পাশে সরে গিয়েছে। শুধু একটা সুন্দর মেয়ের মুখ দেখবার জন্য পৃথিবীর আলোছায়ার এত রূপ এত রহস্যের মূর্তি আর এত রঙের খেলাকে কাছে পেয়েও ভাল করে দেখতে ভুলে গিয়েছে কমলেশ।

এই ক্লান্তি আর ভুল মিথ্যে করে দেওয়া উচিত। মীরাটেই ফিরে গিয়ে কাজের জীবনের সেই যন্তর-মন্তরের যত কঠিন লোহা আর ইস্পাতে ঝনঝনার মধ্যে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারলেই এই ক্লান্তি মিথ্যে হয়ে যাবে। একশো পঁচিশ কিলোওয়াটের ডিজেল ইঞ্জিন ধক ধক করে ধমক দিয়ে মেয়েলী গলায় বাংলা ভাষার

কলরব শোনবার লোভ ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবে। তাই ভাল। কমলেশের নিঝুম ভাবনাগুলি হঠাৎ জেগে উঠে যেন ঝনঝন করে। তাই ভাল, সেই সব গীয়ার সকেট স্ক্রু পিষ্টন আর আরমেচার। যত লোহাড়ে কনডেনসার, ইণ্ডিকেটর আর ট্র্যান্সফর্মার। সুপার-হিটার আর ব্যাটারি চার্জার। হাইটেনসন কেবল্ আর রোটারি। গ্যাস সিলিণ্ডার, ডিস্ক-জকি আর ম্যাগনেটিক ফিলটার। ইঞ্জিনিয়ার কমলেশের কাজের জগৎটা যেন সব একঘেয়েমির তাড়না ভুলে গিয়ে মায়াময় আবেদনের মত কমলেশকে ডাকতে শুরু করেছে।

কিন্তু…হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে আবার কি-যেন ভাবতে থাকে কমলেশ। দার্জিলিং-এর ছোট কাকা যে খুবই দুঃখ করবেন ? ছোট কাকার কাছে গিয়ে অন্তত একটা মাস থাকবো বলে যে আগেই একটা ইচ্ছার আশ্বাস ছোট কাকাকে জানিয়ে দিয়েছে কমলেশ। ছোট কাকাও লিখেছেন, অবশ্যই আসবে। এসে ইচ্ছামত ঘুরে ফিরে, এমন কি দূরের তিস্তা আর গ্রেট রঙ্গিতের রঙীন জল, কিংবা, যদি হিমেল হাওয়া একটু সহ্য করতে পার, তবে আরও দূরে গিয়ে পাইন বনের ছায়ার কাছে কস্তুরী হরিণের মেলা দেখে যেতে পার। তা ছাড়া রডোড্রেনডন আছে, অর্কিডও আছে, যার রঙের উল্লাস দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

রঙের নাম শুনলেই ভয় করে। যাক্, তবু ছোট কাকার অনুরোধ তুচ্ছ না করাই উচিত। দার্জিলিং-এ যাবার জন্যই তৈরী হয় কমলেশ।

[দুই]

শিলিগুড়ি। খেলনা ট্রেনের মত ছোট ট্রেনে ছোট একটি কামরায় ঢুকেই রাঙা হয়ে গেল কমলেশের মুখ। কমলেশের জীবনটাই যেন চোরা মতলবের মত হঠাৎ ফাঁস হয়ে এক জোড়া সুন্দর চোখের কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। কামরার ভিতরে বসে আছে সেই পিতা-পুত্রী। নতুন অশথ পাতার মত রঙের সেই শাড়ির রঙ সকালের আলোতে আরও শোভাময় হয়ে ঝিরঝির করছে।

কমলেশকে দেখতে পেয়ে তরুণীর মুখে একটা মৃদু হাসির শিহর চমকে উঠেছে; যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের কৌতুক সহ্য করতে পারছে না। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের চোখ দুটোও বেশ একটু আশ্চর্য হয়েছে। আজ অন্তত এইটুক প্রমাণ পাওয়া গেল যে, কমলেশকে ওরা দু'জনেই চিনতে পেরেছে। অনেকবার চোখে দেখা একটা মানুষের চেহারা ওরা এরই মধ্যে ভুলে যায় নি, দেখেই চিনতে পেরেছে।

আজ এই প্রথম ওদের চোখের খুব কাছে মুখোমুখি বসে বুঝতে পারে কমলেশ, প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু বেশী প্রৌঢ়, আর তরুণীর চোখ দুটোর নিবিড়-কালো টানা-টানা সুন্দরতা আরও সুন্দর। যাক্, এই দু'জনের চোখের আর মুখের সন্দেহ ভরা বিস্ময়টাকে আর খুঁচিয়ে তোলবার দরকার নেই; যেচে একটা কথা বলতে গেলেই ওরা বিশ্বাস করে ফেলবে যে, বাইনকুলার হাতে এই লোকটা সত্যিই আবু পাহাড় থেকে এই শিলিগুড়ি পর্যন্ত ওদেরই পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছে। ওদের এই

অহংকারে বিশ্বাসটাকে অবজ্ঞা করবার জন্যই চুপ করে বসে থাকে কমলেশ, দু'জনের কারও মুখের দিকে তাকায় না।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—আপনিও কি দার্জিলিং যাবেন?

কমলেশ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসেন—আপনাকেই তো সেই আবু পাহাড়ে, আর···আরও এখানে-ওখানে কয়েকবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

কমলেশ—হ্যাঁ। একবার উজ্জয়িনী ষ্টেশনে, একবার খজুরাহোতে, আর একবার সারনাথের পথে······।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনিও বোধহয় একটা সাইট-সিইং উদ্দেশ্য নিয়ে টুরে বের হয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনাকে বাঙ্গালী বলে বুঝতে পারলে যে ভালই হতো।

কমলেশ হাসে—আমারও একবার ইচ্ছা হয়েছিল আপনাদের একটু জিজ্ঞাসা করে জানতে, আপনারাও বাঙ্গালী কিনা।

চেঁচিয়ে উঠেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক কেন, কেন জিজ্ঞাসা করলেন না? ওঃ, আপনি বড়ই অন্যায় করেছেন।

কমলেশ—আপনারাও তো আমাকে একটু জিজ্ঞেস করলে পারতেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—সত্যি কথা, বলি তবে। আপনাকে দেখে বাঙ্গালী বলে আমার কোন সন্দেহই হয়নি।

কমলেশ—এ কেমন কথা, সন্দেহও করতে পারলেন না?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক—না, আপনার ঐ সুন্দর স্বাস্থ্য, আর এই এত ফরসা গায়ের রং দেখে মনেই হয়নি যে আপনি বাঙ্গালী।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসেন, কমলেশ লজ্জিত হয়, এবং ভদ্রলোকের মেয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নীরবে হাসতে থাকে।

আলাপের জের টেনে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করেন—দার্জিলিংএ আপনার কদিনের প্রোগ্রাম ?

কমলেশ বলে—দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু শুধু টুরিষ্টদের মত মন নিয়ে নয়। ওখানে আমার কাকা থাকেন, তাঁরই কাছে যাচ্ছি।

—আপনার কাকা ? নামটা বলবেন কি ? দার্জিলিং-এ কোথায় থাকেন ?

—আমার কাকা মনতোষ সরকার, জলাপাহাড় রোডে বাড়ি।

—আই সি ! চেঁচিয়ে ওঠেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।—আমার ভেরি ভেরি ডিয়ার ফ্রেণ্ড মনতোষবাবু, তোমার কাকা ? জানতে পারলে যে আবু ডাকবাংলোতেই তোমাকে নেমন্তন্ন করে পায়েস খাওয়াতাম।

তরুণী এইবার কমলেশের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে লজ্জিতভাবে হাসে। এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দেন।—এটি হলো আমার মেয়ে জয়ন্তী, আর আমি হলাম··· কি আর বলবো, বলবারই যে কিছু নেই···আমি হলাম মনতোষবাবুর বন্ধু অতুল দত্ত। আমার একটা চা-এর বাগান আছে। তোমার কি করা হয় ইয়ংম্যান ?

কমলেশ—আমি মীরাটে থাকি, আর একটা চাকরি করি।

—কিসের চাকরি ?

কমলেশ হাসে—মিস্তিরিগিরি। মেশিন মেরামতির কাজ।

অতুলবাবু মাথা দুলিয়ে হাসেন—মিস্তিরিগিরিটা রপ্ত করেছিলে কোথায় ? রুড়কিতে, না শিবপুরে ?

কমলেশ বলে—গ্লাসগোতে।

অতুলবাবু—আমার জয়দেব, এই জয়ন্তীর চেয়ে দু'বছর ছোট, সে'ও এখন গ্লাসগো'তে আছে।

অনেকক্ষণ হলো ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। অতুলবাবু একটা বাক্স খুলে নানা রকমের মেশিনের ছবিভরা ক্যাটালগ হাতে নিয়ে কমলেশের চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন—আমার চা-বাগানের জন্য কিনতে চাই, কিন্তু মডেল দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না, জিনিসগুলি ভাল হবে কিনা?

ক্যাটালগের উপর চোখ বুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় কমলেশ—হাডসনের রোলিং ট্রলি আর ফার্মেন্টিং ট্রে; ও আর দেখতে হবে না। খুব পোক্ত জিনিস।

শুনে খুশি হলেন অতুলবাবু; ক্যাটালগের পাতা অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করলেন, তারপর ক্যাটালগ বুকের উপর রেখে সীটের উপরেই কাত হয়ে পড়ে একেবারে ঘুমোতেই শুরু করে দিলেন।

বাঙ্গালী বলে চিনতে পারলে যিনি আবু পাহাড়েই নেমন্তন্ন ক'রে পায়েস খাওয়াতেন, তিনি মাত্র এই সামান্য কয়েকটি কথায় ও প্রশ্নে আলাপ সেরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর তাঁরই মেয়ে জয়ন্তীর অহঙ্কার যেন জেগে জেগেই ঝিমোতে থাকে। তিনধারিয়া লুপ পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, এর মধ্যে জয়ন্তী ভুলেও একবার কমলেশের মুখের দিকে তাকায়নি।

যখন ঘুম পাহাড়ের দিকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে চড়াই ঠেলে ট্রেন উঠতে শুরু করেছে, তখন হিমেল বাতাসের ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে শিউরে উঠলেও কমলেশের চোখে ঘুমের আবেশ নেমে আসে, এবং ঘুমিয়ে পড়বার আগে মনে মনে হেসেও ফেলে। ওরা বাঙ্গালী হয়েই বা কি লাভ হলো? আর বাঙ্গালী না হলেই বা কি ক্ষতি হতো?

দার্জিলিং ষ্টেশনে ট্রেন থামতেই ব্যস্ত হয়ে ষ্টেশনের হৈ-চৈ

ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে যেন এক নিমেষে মিশিয়ে দিয়ে চলে যায় কমলেশ। অতুলবাবুও যে নামবেন, এবং তাঁকে একটা নমস্কার জানিয়ে চলে যাওয়া উচিত, এই সাধারণ সৌজন্যের বোধ মনের মধ্যে সজাগ থাকা সত্ত্বেও সেই সৌজন্য জানাবার অপেক্ষায় আর দাঁড়িয়ে থাকেনি কমলেশ। থাকতো বোধ হয়; কিন্তু দেখতে পায় কমলেশ, জয়ন্তী যেন বুঝতেই পারছে না, এবং একটা ভ্রূক্ষেপ করেও বুঝতে চেষ্টা করছে না যে, এতক্ষণ ধরে যে মানুষটা তারই চোখের সামনে বসেছিল, সেই লোকটা নেমে চলে যাচ্ছে। কত গম্ভীর হয়ে নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্তী।

[তিন]

কাকিমা বললেন—বার্চ হিল রোডের অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তী যে তোকে চেনে বলে মনে হলো, কমল ?

কমলেশ বলে—কই ? না তো। অতুলবাবু আমাকে চেনেন।

কাকিমা—তার মানে ?

কমলেশ—ট্রেনে দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে। শুধু অতুলবাবু আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

কাকিমা—তুই জয়ন্তীকে চিনিস ?

কমলেশ—চিনি বৈকি।

কাকিমা—জয়ন্তীর সঙ্গে তুই কথা বলেছিলি নিশ্চয়।

কমলেশ—কখ্খনো না।

কাকিমা হাসেন—তাহলে জয়ন্তীকে চিনলি কি করে ?

কমলেশ—তার মানে, শুধু মুখ চেনা। শুধু কয়েকবার চোখে দেখেছি ; এই পর্যন্ত।

কাকিমা—আমিও তো তাই বলছি জয়ন্তীও তোর মুখ চেনে। সেই কথাই বলছিল জয়ন্তী।

কমলেশ—তা হয়তো বলতে পারে। কিন্তু বললেই বা কি আসে যায় ?

কাকিমা হঠাৎ বলে ওঠেন—জয়ন্তীকে বিয়ে করবি তো বল ?

চমকে অপ্রস্তুত হয়ে বিড়বিড় করে কমলেশ—তুমি গুরুজন হয়ে হঠাৎ এ কিরকমের একটা ঠাট্টা করে বসলে, কাকিমা ?

কাকিমা—কেন, জয়ন্তীর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে মন্দ কি ?

কমলেশ—না, মন্দ কেন হবে? কিন্তু ভাল হবে কি? তাছাড়া বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে, তবে তো?

আর একটা কথা কাকিমাকে বলতে ইচ্ছা করে। জয়ন্তীরও ইচ্ছে হবে, তবে তো বিয়ে হতে পারে।

কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে এখানেই আলোচনা থামিয়ে দিতে চায় কমলেশ।

কাকিমা হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হলেও আবার প্রশ্ন করেন—কেন? জয়ন্তীকে দেখতে কি বেশ সুন্দর বলে মনে হয় না?

কমলেশ—দেখতে সুন্দর তো বটেই। চোখে দেখতে ভালই লাগে।

কাকিমা—তোরও তাহলে ভাল লেগেছে বল?

কমলেশ—হ্যাঁ, ভাল লেগেছে বৈকি।

কাকিমা—তবে, আপত্তি কিসের?

কমলেশ বলে—চোখে ভাল লাগলেই বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে, এমন কোন কথা তো নেই।

মিথ্যে বলেনি কমলেশ। নিজের মনের মধ্যে কোন ফাঁকি রেখে কথা বলেনি। সুন্দর চেহারা, দেখতে ভাল লাগে! সেইজন্য আরও একবার, এবং হয় তো বারবার দেখতে ইচ্ছাও করবে। কিন্তু এই দেখবার ইচ্ছাটুকু ছাড়া মনের মধ্যে আর কোন আগ্রহের সাড়া খুঁজে পায় না কমলেশ। সেকেলে মানুষ কাকিমা। চোখে দেখতে পছন্দ হলেই মেয়ে পছন্দ হয়ে যায়, এবং তার পর তাকে বিয়ে করা হয়, এই নিয়মের মধ্যে কোন ভুল দেখতে পারবেনই বা কেন?

কাকিমা যেন তাঁর নিজেরই মনের প্রেরণায় নানা গল্প বলতে শুরু করে দেন। সেসব গল্পের অর্ধেকেরই বেশি হলো অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তীর জীবনের গল্প।

মা নেই জয়ন্তীর। বাপের বড় আদরের মেয়ে। একমাত্র মেয়ে। জয়ন্তী সিমলাতে থেকে পড়তো। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এম-এ পাশ করেছে এই চার বছর হলো; ফিলসফিতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে। তা ছাড়া, যেমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, তেমনি সুন্দর গান গাইতে পারে। সারা দার্জিলিং-এ অমন সৌখীন মনের মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর্কিড পুষতে ওর মতন ওস্তাদ আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ। পর পর তিন বছর জয়ন্তীরই অর্কিড এগ্‌জিবিশনের ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে। অতুল-বাবুর সঙ্গে জয়ন্তী মাঝে মাঝে রাংতুন যায়। সেখানে ওদের চা-বাগানের একটা কুঠিতে এভিয়ারী আছে। নানারকম রঙ্গীন পাখির একটা আড়ত যেন। তিন শো টাকা খরচ করে জয়ন্তীর জন্য তিব্বত থেকে একজোড়া রঙ্গীন কালিজ আনিয়ে দিয়েছেন অতুল-বাবু। তিতির ময়না আর বউ-কথা-কও থেকে শুরু করে বিলিতী রবিন ম্যাগপাই আর কানারিও আছে। পাখির রঙ্গীন পালক দিয়ে নিজের হাতে কার্পেট তৈরী করে জয়ন্তী, সে কার্পেটের উপর পা দিতে মায়া হয়।

শুনলে মুগ্ধ হতে হয়। কাকিমা যেন এক রূপকথার মেয়ের গল্প বলছেন। কমলেশও চুপ করে বসে শুনতে শুনতে আশ্চর্য হয়ে যায়। এবং মনে মনে বুঝতে পেরে লজ্জাও পায় যে, এই গল্প আরও শুনতে ইচ্ছা করছে।

ওদিকে বার্চহিল রোডের বাড়ীতে অতুলবাবুকে একটু আশ্চর্য হতে দেখে জয়ন্তীর কালো চোখের তারাও হঠাৎ একটু চমকে ওঠে!

অতুলবাবু বলেন—কি আশ্চর্য, মনতোষবাবুর ভাইপো সেই ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটি যে সত্যিই একবার একটু দেখা করতেও এল না।

—দেখা করতে আসবে, এরকম কি কোন কথা ছিল? আস্তে আস্তে, গলার স্বরে কোন চঞ্চলতা না জাগিয়ে প্রশ্ন করে জয়ন্তী।

অতুলবাবু—আসবার কথা মানে এই যে···আমি তো ওর কাকারই বন্ধু; তা ছাড়া পথেও যখন আলাপ হলো, তখন একবার নিজের থেকেই এলে এমন কি আর···।

বোধ হয় বলতে চান অতুলবাবু, নিজেকে এমন কি আর ছোট করা হতো। কাকার বন্ধুর সঙ্গে একবার নিজের থেকেই দেখা করতে এলে নিজেকে ছোট করা হয় না।

অতুলবাবু—ছেলেটি দার্জিলিংএ এখন আর নেই বোধ হয়।

জয়ন্তী বলে—আছেন। শুভা মাসিমার সঙ্গে চৌরাস্তায় একবার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন যে, কমলেশবাবু এখনও দার্জিলং-এ আছেন।

—ছেলেটির নাম কমলেশ নাকি?

জয়ন্তী হাসে—হ্যাঁ, তুমি তো ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রেও নামটা জিজ্ঞেসা করনি।

আক্ষেপ করেন অতুলবাবু—বাস্তবিক বড় অভদ্রতা হয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবেন অতুলবাবু। তারপর বলেন—মনতোষ বাবুর কাছ থেকে ছেলেটির···তার মানে কমলেশের অনেক গল্প শুনলাম।

জয়ন্তী চোখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে পার্কের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন বৃথা গল্প শোনবার একটা শাস্তি থেকে দূরে সরে যাবার জন্য চেষ্টা করছে জয়ন্তী। শুনে লাভ কি?

যাকে এতবার চোখে দেখেও কোন লাভ হয়নি, তার জীবনের গল্প শুনে লাভ কি? জয়ন্তীর মনের ভিতরে এই যে প্রশ্নটা সব

চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছে, তার শব্দ অন্য কারও কানে পৌঁছবার কথা নয়।

আবু পাহাড়ের দিলবরা মন্দিরের এক নিভৃতে যার সঙ্গে প্রথম চোখে-চোখে দেখা, সেই মানুষটার মুখের দিকে তাকালে কারও চোখ আঁৎকে উঠবে না, বরং আর একটু ভাল করে দেখতেই ইচ্ছা করবে। জয়ন্তীও দেখতে ভুলে যায়নি! ঐ মুখের ছাঁদ তুলি দিয়ে এঁকে রাখতেও ইচ্ছা করে। সারনাথের পথে টাঙ্গা করে যেতে যেতে আনমনার মত হঠাৎ একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে ছিল জয়ন্তী, মনতোষবাবুর ভাইপো সেটা দেখতেই পাননি। যেচে আলাপ করেন না; এমনই একটি উন্নত অহংকারের মানুষ।

আজ এই বার্চহিল রোডের বাড়ির একান্তে বসে ভাবতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে যায়; আর মনে মনে লজ্জাও পায় জয়ন্তী। উজ্জয়িনী ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অনেকক্ষণ ধরে বসে অনেক চিন্তার মধ্যে হঠাৎ একটা লোভী চিন্তাও যে মনের ভিতর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কোথায় গেলেন সেই ভদ্রলোক?

কন্দর্য মহাদেবের মন্দিরতোরণের কাছে যে মানুষটিকে দেখতে পেয়ে জয়ন্তীর চোখ দুটোও ভুল করে একবার বেহায়া হয়ে গিয়েছিল, সে মানুষ কিন্তু ভুলেও জয়ন্তীকে একটি কথাও বলেনি। জয়ন্তীকে চোখেই পড়েছিল কিনা কে জানে। ভদ্রলোক বোধ হয় তাঁর সুন্দর চেহারা নিয়ে এই বিশ্বাসেই আত্মহারা হয়ে আছেন যে, তাঁর মুখের দিকে তাকাবার জন্য পৃথিবীর সব মেয়ের চোখ ছটফট করছে।

পথে অনেকবার দেখা হয়েছিল, তাই বারবার মনে হয়েছিল, বোধ হয় আর একবার দেখা হবে। দেখতে ইচ্ছাও করেছিল এবং দেখতে ভালই লেগেছিল। সব সত্যি। কিন্তু তাতেই বা কি?

শুভা মাসিমার কথা শুনে অপ্রস্তুত হতেও হয়েছে। শুভা

মাসিমা তাঁর চোখের দৃষ্টিটাকে কেমন যেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—কমলেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তো?

—না, আমার সঙ্গে আলাপ হয় নি। উনি বাবার সঙ্গেই শুধু কয়েকটা কথা বলে আলাপ করলেন।

—এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। তুমি যেমন, আমাদের কমলেশও যে তেমনি, খুব মিশুক মানুষ।

—কিন্তু, কই কমলেশবাবুর হাবে-ভাবে সে-রকম তো কোন লক্ষণ দেখলাম না।

—যাক্, তবু একটু চেনাচেনি হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, মুখ চেনা!

শুভা মাসিমা আবার যেন কেমন করে হাসেন—হ্যাঁ, মুখ চেনা হলেই তো হলো। আর মুখটি দেখতে ভাল লাগলে তো হয়েই গেল।…আমি শিগগির তোমার বাবার সঙ্গে একটা দরকারী কথা বলতে যাব জয়ন্তী। বলে দিও, কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ যেন বাগানে না চলে যান।

শুভা মাসিমার কথাগুলি শুনতে ভাল লাগেনি। ওঁর ভাসুরের ছেলে, কমলেশ নামে গ্লাসগো ফেরত এক ইঞ্জিনিয়ার, বেশ ভাল স্বাস্থ্য আর বেশ সুন্দর মুখ একটি মানুষ। তার সঙ্গে মুখ-চেনা হয়েছে, তাকে দেখতে ভালই লাগে। ব্যাস্, তাহলেই হয়ে গেল?

নিজের মনের মধ্যে কোন ফাঁকি রাখতে চায় না জয়ন্তী। যদি সত্যিই ইচ্ছা হতো, তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাক্, এটা কল্পনা করতেই যে ভাল লাগে না! কোন ইচ্ছাই হয় না।

গল্প বলতে শুরু করেন অতুলবাবু।—কমলেশের মত ভাল বয়লার স্পেশালিস্ট ইণ্ডিয়াতে খুব কমই আছে জয়ন্তী। মনতোষ

বাবুর কাছে সবই শুনলাম। কমলেশের বড় ভাই ব্যারিস্টার, মীরাটেই প্র্যাক্টিস করেন। কমলেশের মাইনে এখন এক হাজার টাকা। তা ছাড়া কনসালটিং ফী ধরলে মাসে আরও এক-দেড় হাজার হবে। মোটামুটি যাকে বলা যায়, বেশ ভাল রোজগেরে ছেলে। কমলেশের মা মীরাটের মেয়ে ডাক্তারদের মধ্যে বেস্ট, সব চেয়ে বেশি সুনাম। কমলেশ নানারকম স্পোর্টসেও এক্সপার্ট। টেনিসে গ্লাসগো'র চ্যাম্পিয়ন। বড় ভাই-এর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, কমলেশের বিয়ে হয় নি। মনতোষবাবুও ঠিক বলতে পারলেন না, কেন এখনও বিয়ে করতে চাইছে না কমলেশ।

গল্প শুনে কমলেশকে আরও ভাল ক'রে চিনতে পারা যাচ্ছে। শুনতে ভালই লাগছে। রূপের মানুষ যে এত গুণের মানুষ হতে পারে, সেটা এই গল্প না শুনলে কল্পনাও করতে পারতো না জয়ন্তী। নীৎসের সুপারম্যানের শক্ত শক্ত নিষ্ঠুরতাগুলি বাদ দিলে যা থাকে, যেন সেই রকমই একটি অসাধারণ মানুষ।

চোখে দেখার পালা শেষ হবার পর কানে শোনার এক নতুন পালা শুরু হয়েছে। অতুলবাবুর গল্প অনেকক্ষণ পরে থেমে যাবার পরেও জয়ন্তীর মনে সেই একই প্রশ্ন চঞ্চল হয়ে ওঠে, শুনেই বা লাভ কি ? শুনলে শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। কিন্তু যার উপর শ্রদ্ধা হবে, তাকেই চির জীবনের সঙ্গী ক'রে নিতে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। আর, সব চেয়ে বড় সত্য হলো, মনের বাধা। মনটাই যে সাড়া দেয় না, ইচ্ছে হয় না।

বড় বেশি আগ্রহ নিয়ে গল্প বলছেন অতুলবাবু। জয়ন্তীর বুঝতে একটুও দেরি হয় না, এই আগ্রহের মধ্যে যেন বার্চহিল রোড আর জলাপাহাড় রোডের একটা সম্মিলিত চেষ্টার আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দুই পরিবারের একটা ইচ্ছা খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু ভুল করছে দুই পরিবারেরই মন। কমলেশ নামে সেই ভদ্রলোক কি ভাবছেন জানবার দরকার নেই, অনুমান করতে পারাও যায় না। কিন্তু যা-ই ভাবুন তিনি, ইচ্ছুক হন বা অনিচ্ছুক হন, কিছুই আসে যায় না। জয়ন্তীর ইচ্ছে নেই। বিয়ের কথা একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠলেই বেশ স্পষ্ট করে আপত্তি জানিয়ে দিতে হবে।

[চার]

রূপকথার মেয়েকে গল্পের মধ্যে শুনতে খুব ভাল লেগেছে। অস্বীকার করে না কমলেশ। কাকিমাও লক্ষ্য করেছেন, বেশ মন দিয়ে আর দু'চোখ শান্ত করে অতুলবাবুর মেয়ের কাহিনী শুনেছে কমলেশ। তাই কাকিমা জানতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, তবু বার্চহিল রোডের বাড়িতে একবারও যায়নি কমলেশ। কাকা মনতোষবাবু একটু চিন্তিতভাবে বলেন—অতুলবাবু বেশ একটু দুঃখ করেই বললেন।

কাকিমা—কি ?

কাকা বলেন—কমল একবার বার্চ হিলের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলে অতুলবাবু খুশি হতেন। আর অতুলবাবুর ধারণা, জয়ন্তীও খুশি হতো।

কাকিমা একটু রাগের সুরে বলেন—আমি বলি কমল না হয় গোঁয়াতুর্মি করে হোক আর লজ্জা করেই হোক, বার্চ হিলের বাড়ীতে আজ পর্যন্ত যায়নি। কিন্তু জয়ন্তী তো এবাড়ীতে একবার আসতে পারতো।

কাকা হাসেন—কে জানে, জয়ন্তীও হয়তো গোঁয়াতুর্মি করে কিংবা লজ্জা পায় বলেই এখানে আসতে চায় না।

দার্জিলিং-এর কত দেখবার মত রূপ দেখা হয়ে গেল, কিন্তু সকালে বা বিকালে বার্চহিল পার্কের লতা পাতা ও ফুলের রূপ কেমন হয়ে যায়, সে রহস্যের ছবি দেখবার সময় হয়নি কমলেশের ; ভুলেও এই পথে কোন দিন আসেনি কমলেশ। অবজার্ভেটরি হিল আর লয়েড বোটানি, ভিক্টোরিয়া ওয়াটারফল আর মহাকালের

গুহা, ঘুরে ঘুরে অনেক কিছুই দেখা হলো। কার্ট রোড ধরে ছায়ায় ছায়ায় আরো দূরে চলে যেতে ভাল লাগে। রবার্টসন রোড আর ম্যাকেনজি রোডের বড় বড় স্টোরে আর শো রুমে ঢুকে জিনিস পত্রের দর জানতেও ভাল লাগে। কিন্তু তারপর?

ঘুম পাহাড়ের কুয়াশাকেও সেদিন খুব ভাল লাগলো। সকালের ট্রেনে ঘুমে এসে দুপুর পর্যন্ত বেড়াতে বেড়াতেই পার করে দিল কমলেশ। তিব্বতীদের মঠ দেখে আর কার্ট রোডের পাশে কুয়াশা ভেজা শালের আশে-পাশে ঘুরে যখন স্টেশনে এসে বসলো কমলেশ, তখন কুয়াশা আরও নিবিড় হয়ে সারা স্টেশনটাকেই যেন ঝাপ্‌সা করে দিয়েছে। কমলেশের বাইনকুলার আজ ব্যর্থ। বাইনকুলারের চোখও আজ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, দূরের বা নিকটের কোন রঙ্গীন শোভার মায়াকে কাছে ধরে আনতে পারে না। তবু এই হিমেল কুহেলিকার আবরণও যেন একটা শীতল ও শিহরিত মায়ার খেলা। চুপ করে বসে নিজেরই বুকের ভিতরের যত অদ্ভুত নিঃশ্বাসের খেলাগুলিকে ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

পশমী ওভারকোট গায়ে দিয়ে যে নারীর মূর্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে কমলেশের চোখের কাছে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তার মুখটা বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পায় কমলেশ। জয়ন্তীর সেই মুখ, যে মুখটা রঙীন আলেয়ার মত গত এক মাসের মধ্যে অনেকবার কমলেশের চোখের সম্মুখে এসেছে, সরে গিয়েছে, আর লুকিয়ে পড়েছে। সেই জয়ন্তী, যার জীবনের গল্পগুলিকে শুনতে রূপকথার মত মনে হয়েছে আর ভাল লেগেছে।

বোধ হয় মনে করেছিল কমলেশ, অতুলবাবুও কাছেই আছেন। এদিক-ওদিক তাকায় কমলেশ, এবং কৌতূহল চাপতে না পেরে হঠাৎ বলেই ফেলে—আপনার বাবা কোথায়?

জয়ন্তী বলে—বাবা আসেন নি। আপনি এখানে কখন্ এলেন?

কমলেশ—সকালের ট্রেনে এসেছি। এইবার ফিরে যাব। আপনি?

জয়ন্তী—আমি রাংতুন থেকে আসছি।

কমলেশ—কবে রাংতুনে গিয়েছিলেন।

জয়ন্তী—কাল ; বাবা এখন কয়েকটা দিন রাংতুনে থাকবেন।

কমলেশ—তাই নাকি ? তা হলে তো আর····।

জয়ন্তী—বাবার সঙ্গে আপনার কোন কাজের কথা ছিল ?

কমলেশ হাসে—না, কাজের কথা কিছু নয়। আমি খুব সম্ভব আর এক সপ্তাহের মধ্যে মৌরাট ফিরে যাচ্ছি। ভেবেছিলাম, যাবার আগে আপনার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।

জয়ন্তী হাসে—বেশ তো, এখনই দার্জিলিং-এ না ফিরে, এখান থেকেই সোজা রাংতুন চলে যান না।

কমলেশ—গেলে আজই ফিরতে পারা যাবে তো ?

জয়ন্তী —না, আজ আর ফিরতে পারবেন না।

কমলেশ—কেন ? যাওয়া-আসার ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না ?

জয়ন্তী—পাওয়া যাবে। কিন্তু বাবা কি আপনাকে আজ ছেড়ে দেবেন ? কখনই না।

কমলেশ—তাহ'লে তো আর-এক বিপদ। কাকিমা কিছু বুঝতে না পেরে ভেবে ভেবে অস্থির হবেন।

জয়ন্তী—সেজন্য আপনি ভাববেন না। আমি আপনার কাকিমার কাছে খবর পাঠিয়ে দেব।

কমলেশ কি যেন চিন্তা করে। তার পরে আনমনার মত বলে—না আজ থাক্, যদি পারি তবে না হয় আর একদিন সময় করে রাংতুন বেড়িয়ে আসবো।

ট্রেন এসে গিয়েছে। কমলেশ ব্যস্তভাবে কথা বলতে গিয়ে হেসেই ফেলে—তবে একটা কথা, আপনি যদি রাংতুনে থাকেন, তবেই আমি রাংতুন যাব।

চমকে ওঠে জয়ন্তীর চোখের তারা। তারপর জয়ন্তীও হেসে ফেলে—খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, আমি রাংতুনে কখন্ থাকি বা না থাকি।

ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দ, লোকজনের হৈ-হৈ আর দু'জনের হাস্যময় কলরব প্রথম আলাপের মিথ্যা ভয়টাকে যেন এক মুহূর্তেই তুচ্ছ করে আর ঠাট্টা করে দূরে সরিয়ে দিল। ব্যস্তভাবে একই সঙ্গে দু'জনে হেঁটে গিয়ে ট্রেনের একই কামরার একই সীটে পাশাপাশি বসে কমলেশ আর জয়ন্তী।

অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে দু'জনেই গম্ভীর হয়ে বসেছিল। এই ঘটনাটাকেই অদ্ভুত একটা অঘটন বলে মনে হয়' জয়ন্তীর দু'চোখের কালোর গভীরে যেন একটা চিন্তা ছলছল করে, আর কমলেশের চোখে সুস্থির হয়ে ফুটে থাকে একটি ভাবনার বিস্ময়। আবু পাহাড় থেকে ছুটতে ছুটতে দু'টো ছাড়াছাড়ি প্রাণ যেন এতক্ষণে জিরোবার মত একটা ঠাঁই পেয়ে দু'জনেই একসঙ্গে পাশা-পাশি বসে পড়েছে। অদেখা নয়, অনেক দেখা আর অনেক শোনার মায়া দিয়ে তৈরী একটা টান এতদিনে হঠাৎ একটা সুযোগের লগ্ন পেয়েই দু'জনকে কাছাকাছি করে দিয়েছে।

কমলেশ বলে—আমি এর মধ্যে একদিনও আপনাদের বাড়ি যেতে পারিনি বলে আপনার বাবা বোধহয় আমাকে একটু ভুল বুঝেছেন।

জয়ন্তী—ভুল কিছু বোঝেননি, আশা করেছিলেন যে, আপনি দেখা করতে আসবেন।

কমলেশ—আপনি নিশ্চয় আশা করতেও চাননি।

জয়ন্তী মুখ নামিয়ে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। মৃদু স্বরে বলে—আমার কথা ছেড়ে দিন।

কমলেশ—আপনিও তো একবার জলাপাহাড় রোডের বাড়িতে যেতে পারতেন।

জয়ন্তী—আমি তো যেয়েই থাকি। অনেকবার গিয়েছি। আপনার কাকিমা অর্থাৎ শুভা মাসিমা আমাকে খুব চেনেন।

কমলেশ—সেই জন্যই তো আমার অভিযোগ যে বাড়িতে এতবার গিয়েছেন, সে বাড়িতে আর একবারও গেলেন না, এর কারণ একমাত্র এই হতে পারে যে, এখন একটা মিস্তিরী সেই বাড়িতে আছে।

কোন উত্তর না দিয়ে মুখ তুলে কমলেশের মুখের দিকে তাকায় জয়ন্তী। আস্তে আস্তে বলে—আপনার এসব কথার কোন মানে হয় না।

কমলেশ—বুঝলাম, আমিই বার্চ হিলের বাড়িতে গিয়ে আপনাকে চমকে দিলে খুব মানে হতো।

—মানে কিছুই হতো না ; কারণ, আমি চমকে উঠতাম না।

কমলেশ গম্ভীর হয়—আপনি একটু বেশী ফিলসফার।

চুপ করে বসে থাকে দু'জনেই। দার্জিলিং ষ্টেশনে এসে গাড়িটা থেমেও গিয়েছে। হঠাৎ যেন একটু ক্ষুব্ধ ঠাট্টার স্বরে হেসে ওঠে কমলেশ—এত কথা বললেন, তবু এই সামান্য কথাটা বলতে পারলেন না যে, একবার চা খেতে আসবেন।

জয়ন্তীও হাসতে চেষ্টা করে।—বলেছি তো। আর কিভাবে বলতে হয় জানি না।

লজ্জিত হয় কমলেশ। এতদিন পরে কমলেশের জীবন একটা ডাক শুনতে পেয়েছে ; কিন্তু কন্দর্প মহাদেবের মন্দির তোরণের কাছে যে মেয়ের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছিল, সেই মেয়ে নয় ; খুবই শান্ত ভদ্র আর শক্ত ফিলসফির মেয়ে ডেকেছে।

কমলেশ বলে—আচ্ছা, যাব।

[পাঁচ]

দূর থেকে চোখে দেখার পালা আর দূর থেকে কানে শোনার পালা ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কাছ থেকে আর পাশাপাশি বেড়িয়ে মনে প্রাণে জানাজানির পালা। দূর থেকে চোখে দেখতে ভাল লেগেছিল, দূর থেকে কানে শুনতেও ভাল লেগেছিল। এখন কাছে কাছে থেকে জানতেও ভাল লাগছে বৈকি।

রঙ্গিত রোড ধরে নামতে নামতে আর এগিয়ে যেতে যেতে পাথরের গায়ে আঁকা রঙীন ছবি দেখে থমকে দাঁড়ায় কমলেশ আর জয়ন্তী। বোধিসত্ত্ব পদ্মসম্ভবের মুদ্রা আর আসনের ভঙ্গীটি দেখতে বেশ লাগে। এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর আবার এগিয়ে যায় কমলেশ আর জয়ন্তী।

এক একদিন বার্চহিল রোড ধরে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যেয়ে, সেণ্ট জোসেফ কলেজকে পিছনে ফেলে রেখে নীরব নিরালার কোলে গিয়ে দাঁড়াতে, পথের পাশে ছায়াময় একটি তরুকুঞ্জের কাছে বসতে ভাল লাগে। বুনো সবুজের ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে দূরান্তের তুষারময় শিখরশোভার সাদার দিকে যেতে যেতে যেন হঠাৎ মরে গিয়েছে। কমলেশ আর জয়ন্তী যেন মুগ্ধ হরিণ-হরিণীর মত, কথা বলার সব আবেগ হারিয়ে শুধু নীরবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে।

রাংতুন থেকে একবার এসেছিলেন অতুলবাবু। আবার বাগানে চলে গিয়েছেন। যাবার আগে শুনে খুশি হয়ে গিয়েছেন, বার্চহিল রোডের কমলেশ এসে চা খেয়ে গিয়েছে। যাবার আগে মনতোষ-বাবুর সঙ্গে একটা জরুরী বিষয় আলোচনা করেও গিয়েছেন।

জলাপাহাড় রোডের বাড়িতেও জয়ন্তী এসেছে। চা খেয়েছে। তারপর কমলেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে বেড়াতে চলে গিয়েছে। কোথায় কতদূরে, সে খবর রাখেন না কাকিমা। বোধ হয় বেড়াতে বেড়াতে প্যারেড গ্রাউণ্ড পার হয়ে ওরা ক্যাণ্টনমেণ্ট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দেখে খুশি হয়েছেন কাকিমা. দুটিতে বেশ ভাব হয়েছে।

বার্চ হিল রোডের বাড়িতে লনের আশে-পাশে অর্কিডের স্তবকের কাছে দাঁড়িয়ে সেদিন যখন জয়ন্তীর হাত ধরে ফেলে কমলেশ, তখন সন্ধ্যা শেষ হয়ে এসেছে, আর ড্রইং রুমের ভিতরে আলো চমকে উঠেছে।

কমলেশ বলে—আমার ছুটির আর মাত্র এক মাস আছে জয়ন্তী।

জয়ন্তী—তাহলে মিছিমিছি কেন আর হাত ধরছো?

কমলেশ—এতদিনে তোমাকে জানতে পেরেছি, তাই।

এ সত্য জয়ন্তীও অস্বীকার করে না। জয়ন্তীর হাতটা ধরে রেখেছে কমলেশ, একটুও আপত্তি করেনি জয়ন্তী। দু'জনেই দু'জনকে জানতে পেরেছে। কোন ভুল নেই, রূপকথার মেয়ের মত রঙীন রূপে সাধে আর শিক্ষায় সুন্দর এই মেয়েকে কাছে বসিয়ে রাখতে কমলেশের ভাল লাগে। জয়ন্তীরও ভাল লাগে কমলেশ নামে এই রূপের আর গুণের মানুষটির কাছে বসে থাকতে। সেদিন রাগ করে যে কথাটা মনে মনে বলে ফেলেছিল জয়ন্তী, আজ মনে হয়, সেই কথাটার মধ্যে একটা ভুল ছিল। রাগ করে ধারণা করার ভুল। নীৎসের ভয়ানক সুপারম্যানের শক্ত শক্ত নিষ্ঠুরতাগুলি বাদ দিলে যা থাকে, ঠিক তাই নয়, তার চেয়ে অনেক ভাল; কবিদের কথায় যাকে বলে—তরুণ শিবের মত সকলসুন্দর একটি মানুষ।

জয়ন্তীকে ভাল লাগে, মনে প্রাণে বুঝতে পারে কমলেশ।

জয়ন্তীও যে বুঝে ফেলেছে, কমলেশ নামে এই মানুষটিকে মনে-প্রাণে ভাল লেগেছে। আর, সেইজন্যই বোধহয় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াকে আর দূরের চা-বাগানের থরে থরে সাজানো সবুজকে দেখতে নতুন করে এত ভাল লাগছে।

ড্রইং-রুমের নিভৃতেও এসে একই কৌচের উপর পাশাপাশি বসে থাকে কমলেশ আর জয়ন্তী। কমলেশ বলে—একটি প্রশ্ন করবো?

—কি প্রশ্ন?

—খজুরাহোতে কন্দর্য মহাদেবের মন্দিরতোরণের কাছে তুমি ছুটে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিলে, মনে আছে কি?

—মনে আছে।

—কেন, কিসের জন্যে?

জয়ন্তী হাসে—আজ মনে হচ্ছে, তোমারই জন্য?

—আমাকেও কি একটা পাথর বলে মনে হয়েছিল?

—সেদিন মনে হয়েছিল বটে।

—আজ আমাকে কি মনে হচ্ছে?

—আমাকে তোমার যা মনে হচ্ছে।

জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে কমলেশের চোখের দৃষ্টি যেন উতলা নিঃশ্বাসের দোলায় বিহ্বল হয়ে দুলতে থাকে। কমলেশের দু'হাতের দুই শক্ত মুঠোর মধ্যে বন্দী হয়ে জয়ন্তীর দুটি হাত একটি মত্ত শিহরের ছোঁয়া অনুভব ক'রে শিউরে ওঠে। কি ভাল লাগে? কেন ভাল লাগে? দুটি প্রশ্নের উত্তর এক নীরব আবেগের সঙ্গীতের মত দুটি বক্ষের নিঃশ্বাসের মধ্যে বেজে উঠেছে। দু'জনে দু'জনের দুই সুন্দর শরীরের সব স্পন্দনের ধ্বনি লুব্ধ হয়ে শুনছে। যে ভঙ্গী দেখতে পেলে পাথরের মিথুনও চোখ বড় করে তাকাবে, স্বাস্থ্য ও সুন্দরতার দুটি শোণিতময় দেহ যেন সেই ভঙ্গীই খুঁজছে। আলো জ্বলছে, ড্রইং-রুমের দরজা খোলা,

সবই বোধহয় ভুলে গিয়েছে ভাল-লাগার আবেগে উন্মনা দু'টি মানুষ।

কমলেশ ডাকে—জয়ন্তী

জয়ন্তী—বল।

কমলেশ—বলবার কিছুই নেই।

জয়ন্তী—আমিও কিছু বলতে চাই না।

কিন্তু আপত্তি করলো একটি মোটর-কারের হর্ণের হঠাৎ শব্দ। ফটক খুলে দিচ্ছে রাম সিং, এবং গাড়ীটা রোডের উপর থেকে গোঁ গোঁ করে সবেগে ফটক পার হয়ে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ালো। ধকধক করছে গাড়ির এক জোড়া হেড লাইট। সেই সঙ্গে গাড়ির ভিতর হুল্লোড় করে চেঁচিয়ে ওঠে এক পাল ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে। জয়ন্তী দি। জয়ন্তী দি!

কমলেশের মুখের দিকে ব্যথিতভাবে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী। কমলেশ বলে—কারা যেন এসেছে।

জয়ন্তী বলে—কার্সিয়ং থেকে ভক্তি পিসিমা এসেছেন।

—আমি আজ তা'হলে আসি?

—আসুন।

[ছয়]

কাকিমা বললেন—তোর কাকার ইচ্ছে, এইবার অতুলবাবুর সঙ্গে একবার আলোচনা ক'রে বিয়ের কথাটা পাকাপাকি ক'রে ফেলাই উচিত।

চমকে ওঠে কমলেশ—কার বিয়ে?

কাকিমাও আশ্চর্য হন—তোর, আবার কার? জয়ন্তীর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা।

কমলেশ—না, তোমরা না বুঝে-সুঝে এসব ব্যাপারে হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠবে না।

কাকিমা রাগের সুরে বলেন—বুঝতে কি আর বাকি আছে? তোরা কি বুঝিয়ে দিতে কিছু বাকি রেখেছিস?

কমলেশ—খুব ভুল বুঝেছ তোমরা।

বুঝতে কোথায় ভুল হলো, চুপ করে ক্ষুব্ধ মনে তাই বুঝতে চেষ্টা করেন কাকিমা। আর, কমলেশ ঘরের ভিতরে গিয়ে বন্ধ জানালার কাঁচে কুয়াশার প্রলেপের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, সত্যিই তো, বিয়ের কথা শুনেই মনটা এত জোরে আপত্তি করে উঠলো কেন?

মনের ভিতরে একটা লজ্জাকর ক্লেশ অস্বস্তি ছড়াতে থাকে। ঝোঁকের মাথায় খুবই খারাপ একটা অন্যায় করে চলেছে তার এই কদিনের দার্জিলিং-এর জীবন। জয়ন্তী নামে ঐ মেয়েকে ভাল-বাসবার জন্য জীবনটা যেন একেবারে হন্তদন্ত আর ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মনটাই বিশ্বাস করতে পারছে না যে, সত্যিই

ভালবাসতে পারা গিয়েছে। নইলে বিয়ের কথা শুনেই মনটা চমকে আর ভীরু হয়ে পিছিয়ে যায় কেন?

সেই গাড়ির হঠাৎ হর্ণের শব্দটাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। মস্ত বড় একটা ভুল থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ঐ শব্দটা। জয়ন্তীকে ভাল লাগে ঠিকই; কিন্তু কি ভাল লাগে? সেই সন্ধ্যার সেই ভুলের ইচ্ছাটাই এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে দিয়েছে। আর, গাড়ীর হর্ণ সেই ইচ্ছাটাকে হঠাৎ একটা রূঢ় শব্দের আঘাত হেনে চমকে দিয়ে দুঃসহ লজ্জা পাইয়ে দিয়েছে। ড্রইং-রুমের কৌচের উপর পাগল হয়ে ওঠা খেয়ালটার জন্যই কি বিয়ে? তবে সত্যিই বিয়ে করবার দরকার কি? আর জয়ন্তীকেই বা বিয়ে করবার দরকার হবে কেন?

মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করে, চিন্তাগুলি যেন নিশ্চিন্ত একটা মীমাংসা খুঁজে পায় না। এক এক সময় মনে হয়, নিজেরই বিরুদ্ধে ভণ্ডামি করছে কমলেশ। আবার মনে হয়, সে নিজেই একটা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু জয়ন্তীকে বিয়ে করবার জন্য কোন ইচ্ছা যে আজও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে না, এটুকু বুঝতে অসুবিধে নেই।

চিন্তাটা মাথার ভিতরে ক্লান্তি ধরিয়ে দিচ্ছে। জয়ন্তীকে বিয়ে করতে ইচ্ছা হোক্, এইটুকুর জন্য নীরবে প্রার্থনা করছে কমলেশের মন। নইলে, এতদিনের এত দেখা শোনা আর জানার সব আনন্দ যে কতগুলি হীন জুয়াচুরির আনন্দ হয়ে যাবে।

কি ভাবছে জয়ন্তী? মনে পড়তেই জয়ন্তীর উপর রাগ হয়। জয়ন্তীই বা কেন কোন আপত্তি না ক'রে নিজেকে এমন ক'রে ধরা পড়িয়ে দিল? জয়ন্তী কি নিজেকে শুধু একটা এলিয়ে পড়া সুন্দর আর নরম শরীর বলে মনে করে?

বার্চহিল রোডের বাড়িতে ভক্তি পিসিমাও বুঝতেই পারছেন

না, কেন এমন ক'রে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বিছানার উপর পড়ে আছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর মুখটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তবু বুঝতে পারা যায়, মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

অতুলবাবু বলেন—থাক্, ওকে আর কিছু জিজ্ঞেসা করিস না ভক্তি। আমার মনে হয়, ওর মার কথা মনে পড়ে কাঁদছে।

ভক্তি পিসিমা বিচলিতভাবে বলেন—মার কথাই বা হঠাৎ মনে পড়লো কেন?

অতুলবাবু—মনে পড়বার একটা কারণ এই যে, আজ ওর বিয়ের কথা শুনে সব চেয়ে খুশি হয়ে উঠতো যে মানুষটা, সে-ই আজ নেই। অথচ ওর বিয়ের কথা একরকমের...। বলতে গিয়ে অতুলবাবুর চোখও ছলছল করে।

ভক্তি পিসিমা—কার সঙ্গে বিয়ে? ছেলেটি কি করে?

অতুলবাবু—খুব ভাল ছেলে। জলাপাহাড় রোড়ের মনতোষ-বাবুর ভাইপো কমলেশ, মীরাটে থাকে, ইঞ্জিনিয়ার।

মুখ তোলে জয়ন্তী—বিয়ের কথা চলছে কেন?

অতুলবাবু অপ্রস্তুত হন—আমরা তো বুঝেছি, এইবার বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত।

জয়ন্তী—না।

আশ্চর্য হন অতুলবাবু—কেন?

জয়ন্তী—বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই।

—থাক তবে! অতুলবাবু উঠে দাঁড়ান, অতুলবাবুর এত শান্ত আর স্নেহার্দ্র গলার স্বরেও যেন বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে।

জয়ন্তী বলে—তুমি কিছু মনে করো না।

অতুলবাবু—না, কি আর মনে করবো, যদি কখনও ইচ্ছে হয় তো বলিস।

অতুলবাবু চলে যেতেই ভক্তি পিসিমা ফিসফিস ক'রে বলেন—

বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না কেন জয়ন্তী? বল, আমার কাছে একটু খুলেই বল। ছেলেটির সঙ্গে চেনাশোনা আছে?

—হ্যাঁ।

—ছেলেটি কেমন?

—খুব ভাল।

—তবে?

—তবুও বিয়ের কথা ভাবতে ভাল লাগছে না।

—তাহলে বল, ভয় করছে।

—ভয় করছে বৈকি। বিয়ে মানে ঐ, সেই তো, ও আর কতদিন ভাল লাগবে?

ভক্তি পিসিমা যেন শিউরে উঠলেন। আর কোন কথা না বলে নিজের কাজে চলে গেলেন। কাজ বলতে তাঁর ঐ একটি কাজ, উল বোনা। গল্পে আছে ভক্তি পিসিমা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও উল বুনতে পারেন। একটাও ঘর ভুল হয় না।

এই ক'দিনের জানাজানির জীবনে কিছুই তো খারাপ লাগেনি। বরং আরও ভাল লেগেছে। সন্ধ্যার ড্রইং-রুমের নিভৃতে বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা সেই ইচ্ছার ব্যাকুল ঝঞ্ঝাকেও ভালই লেগেছে; এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না জয়ন্তীর মন। কাঁটার মত মনের ভিতর বিঁধছে, শুধু সেই প্রশ্ন—যে-মানুষকে চিরজীবনের বান্ধব বলে বরণ করে নেবার কথা কখনো মনে হয়নি, তার হাতের মুঠোর মধ্যে হাত ছেড়ে দিলে কেন?

বিয়ের কথা ভাবতে ইচ্ছা করে না, এ যে আরও এক লজ্জাহীন রহস্য। রহস্যটা যেন জয়ন্তীর এই সুন্দর দেহের আর মনের সব সম্মানের ছবিটাকেই ঠাট্টা করছে আর ঠুকে ঠুকে সব রং ঝরিয়ে দিচ্ছে। কমলেশ তার জীবনের কাছে হঠাৎ-পাওয়া এক রূপকথাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। জয়ন্তীও তার জীবনের কাছে ছুটে আসা

তরুণ শিবের মত সকলসুন্দর এক সুপারম্যানের কাঁধে মাথা রেখেছিল। বাস্, জানাজানির জীবন এই পর্যন্ত এগিয়ে এসে ঐ ভাবে আঁকা হয়ে পড়ে থাকলেই তো ভাল ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য মুখোসপরা ডাকাতের মত কতকগুলি ভয়ানক নিঃশ্বাস যেন হঠাৎ এসে সেই শান্ত ভঙ্গির ছবিটাকে ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে একেবারে বুকের রক্ত দাবী করে বসলো। আপত্তি করতে পারে নি জয়ন্তী, আপত্তি করেনি কমলেশ, শুধু গাড়ির হর্ণটা আর্তনাদ করে উঠেছিল বলেই সেই ইচ্ছার গ্রাস থেকে সরে যাবার সুযোগ হয়েছিল।

কিন্তু, আজই আবার তো দেখা হবে। কমলেশ কি না এসে পারবে? এখুনি রাংতুন চলে গেলে কেমন হয়? বিকাল শেষ হয়ে আসছে। এখন যাওয়াই বা যায় কেমন করে?

চুপ করে দু'হাতে মাথা টিপে ধরে শুধু ভাবতে থাকে জয়ন্তী, আর মনের ভিতরটাও মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সত্যিই অদ্ভুত! ভাল লাগছে না; সেই পাগল ইচ্ছাটার উপরে ভয়ানক ঘেন্না হচ্ছে। তাই পালিয়ে যেতে চায় জয়ন্তী।

সারা সকালটা অর্কিডের যত্ন করতে করতেই জয়ন্তীর সময় ফুরিয়ে গেল। আসেনি কমলেশ।

রাংতুনের কুঠিতে এভিয়ারীর রঙীন কালিজের দল এখন কেমন আছে কে জানে? কতদিন ওদের যত্ন করা হয়নি। এই ক'দিন জীবনের সব চেয়ে আদরের কাজগুলিকেই যেন ভুলে গিয়েছিল জয়ন্তী। এক এক করে মনে পড়ছে।

লণ্ডন থেকে দুটি প্যাকেট আজ চারদিন হলো এসে টেবিলের উপরেই পড়ে রয়েছে। দুটি অ্যালবাম। রেমব্রাণ্ট আর ভ্যান গোগ। প্যাকেট দুটো খুলে দেখবারও সময় হয়নি। শুধু ঘুরে বেড়িয়ে সময় ফুরিয়েছে।

শেল্‌ফের বইগুলিতেও যে ধুলোর আবরণ পড়েছে। এই ক'দিনের মধ্যে একটিবারও, দশ মিনিটের জন্যও, একটা বই স্পর্শ করবার সুযোগ হয়নি। স্পিনোজা'র শেষ ভল্যুমের শেষে পঞ্চাশটা পাতা বাকি আছে। আজ পর্যন্ত বাকি রয়েই গিয়েছে। পড়বার সময় হয়নি।

গান? জয়ন্তীর গলাটা যে গাইতে জানে, সেটাও যেন এই ক'দিন ভুলেই গিয়েছিল জয়ন্তী। ভক্তি পিসিমা আজ গানের কথা বারবার বললেন বলেই স্বরলিপির বই আর এসরাজটার দিকে জয়ন্তীর চোখ পড়েছে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই কদিনের জানাজানির জীবনে কমলেশ তো কত কথাই বলেছে, আর জয়ন্তীর কান দুটোও সে-সব কথা শুনে শুনে মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু কই? একদিনের জন্যও কমলেশ তো জয়ন্তীর এই আদরের জগতের কোন রূপ দেখবার জন্য ভুলেও একটু আগ্রহ, এক বিন্দু কৌতূহলও দেখালো না? জয়ন্তীর হাতের উড-কাট এচিং আর অয়েল, কত গুণী মানুষের চোখ যা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে, তার রূপ দেখবার জন্য কমলেশের চোখে কোনদিন একটু পিপাসার সাড়াও দেখতে পাওয়া যায় নি। জয়ন্তী গান গাইতে জানে কি না, এই প্রশ্নটাও কোনদিন ভদ্রলোকের মনে মুখর হয়ে ওঠে নি। নইলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতো। তা হলে কিসের জন্যে? তাহ'লে কি ভাল লাগলো? শুধু সেই, সেই একটা ইচ্ছাকে আর এই একটা চেহারাকে?

বিকাল হয়েছে। বারান্দার উপর চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে উল বুনছেন ভক্তি পিসিমা। এবং তেমনি চোখ বন্ধ রেখে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হঠাৎ ডাক দিলেন—দেখ তো জয়ন্তী, সেই ছেলেটিই বোধ-হয় এসেছে।

চমকে ওঠে জয়ন্তী। বুঝতে পারে, হ্যাঁ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঠিকই

দেখেছেন ভক্তি পিসিমা। গেট পার হয়ে কমলেশই লনের কিনারা ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকে আসছে।

ভক্তি পিসিমা বলেন—আমি ভিতরে যাচ্ছি জয়ন্তী, তোরাই এখানে বসে গল্প কর।

যা দেখবে বলে ভয় করেছিল জয়ন্তী, তার কিছুই দেখা গেল না। কমলেশ হাসছে। চেহারাটাকে যেন একেবারে বদলে একেবারে শান্ত ও স্নিগ্ধ করে নতুন মূর্তি ধরে কমলেশ এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ নয়, লজ্জিত নয়, ব্যথিত নয়, মুগ্ধ নয়, লুব্ধও নয়।

কমলেশ বলে—এইবার মীরাট ফিরে যাবার কথা মনে পড়েছে। তাই ভাবলাম, যাই। আর্টিষ্ট জয়ন্তীর হাতের আঁকা যত ছবি দেখে, আর যদি রাজি হয় তো, জয়ন্তীর গলার গান শুনে চলে যাই।

জয়ন্তী চুপ করে দাঁড়িয়ে কমলেশের কথাগুলিকে যেন দু'চোখের অপলক নিবিড়তা দিয়ে শুনতে থাকে। কমলেশ তেমনই খুশির স্বরে আবার বলে ওঠে—আমি সবই শুনেছি। শুধু···।

যেন একটা লজ্জার আঘাত পেয়ে হঠাৎ থমকে যায় কমলেশের মুখের ভাষা। তার পরেই বলে—শুধু এই কদিনের ছুটোছুটির জন্য ভুলেই গিয়াছিলাম যে—!

জয়ন্তী আস্তে আস্তে বলে—কি ভুলে গিয়েছিলেন?

কমলেশ বিব্রতভাবে বলে—আপনার জীবন হলো যত সুন্দর সুন্দর গান ছবি রং আর ফিলসফির জীবন।

জয়ন্তী—আমিও যে ভুলে গিয়েছি···

কমলেশ—না না, আপনি কোন ভুল করেন নি।

জয়ন্তী হাসে—আমিও তো অনেক কিছুই শুনেছি, কিন্তু আপনার কাছ থেকে শুনতে ভুলে গিয়েছি।

কমলেশ চমকে ওঠে—কি শুনলেন? কার কাছ থেকে শুনলেন?

জয়ন্তী—বাবাই বলেছেন ; সারা ইণ্ডিয়ার মধ্যে যাঁর মত ভাল টেকনোলজিষ্ট খুব কমই দেখা যায়, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসাও করতে পারিনি যে, তাঁর আদরের জগৎটা দেখতে কেমন ?

কমলেশ—দেখতে খুব ভাল। প্রথম প্রথম দেখে হয়তো আপনারও ভাল লাগবে না। কিন্তু একবার ঐ মেশিনের যত মান-অভিমান চালাকি রাগ আর ফুর্তির রহস্যটার ভিতরে গিয়ে উঁকি দিতে পারলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এক শো পঁচিশ কিলোওয়াটের এক একটা দুর্দান্ত যখন বিদ্রোহ করে বসে, তখন হিমসিম খেতে হয়। কোথায় কোন্ এক ছোট্ট পিনের ফাঁকে ফেল্টের একটা কুচি লুকিয়ে রেখে কমপ্রেসরগুলো যেন সারাদিন ঠাট্টা করতে থাকে ; সব এয়ার প্রেসার আর ম্যাগনেটিক অ্যাকশন বানচাল হয়ে যায়।

চুপ করে যেন নিজের আদরের জগৎটাকে স্বপ্নালু চোখ নিয়ে দেখতে থাকে কমলেশ। জয়ন্তী বলে—কি হলো, থেমে গেলেন কেন ?

কমলেশ—একটা ইচ্ছে আছে। অ্যাটমিক রিসার্চে চলে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে বড় লোভ হয়। সেটা আরও মজার মায়ার ও আশ্চর্যের খেলা।—আপনি কি সায়েন্সের কিছুই জানেন না ?

জয়ন্তী হাসে—জানি বৈকি। এইচ-টু-ও হলো জল।

কমলেশও হাসে—বুঝলাম, আমি যেমন ফিলসফার আপনিও তেমনি সায়েন্টিষ্ট।—কই, আপনার হাতে আঁকা ছবি ?

কোন উত্তর না দিয়ে আনমনার মত চোখ ফিরিয়ে লনের দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী। মুখটা হঠাৎ যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তারপরেই হাসতে চেষ্টা করে—না, আজ নয়। যেদিন মীরাট রওনা হবেন, সেদিন যাবার আগে একবার এসে দেখে যাবেন।

—তারপর ?

—তারপর আর কি? যদি ইচ্ছে হয় তবে মীরাট থেকে একটা চিঠিতে জানাবেন, ছবিগুলি দেখতে কেমন লাগলো! অনায়াসে হেসে হেসে বলতে থাকে জয়ন্তী।

যে প্রশ্নের উত্তর শোনবার জন্য এই বিকালে জলাপাহাড় রোড থেকে বার্চ হিল রোডের এই বাড়িতে আজ এসেছে কমলেশ, সেই প্রশ্নের উত্তর শোনা হয়ে গেল। সারা রাত এই প্রশ্নটাই কমলেশকে ঘুমোতে দেয় নি। জয়ন্তীকে বিয়ে করবার জন্য কমলেশের মনের ভিতর কোন আগ্রহ আকুল হয়ে ওঠে না। জয়ন্তীর মনেরও কি এই দশা? যদি তাই হয়, তবেই ভাল।

যাক, ভয়াতুর সন্দেহটাকে একেবারে নির্ভয় করে দিয়েছে জয়ন্তী। আমিও যে তোমার সঙ্গে মীরাটে যাব, এমন ইচ্ছা বা আশার দাবী করে বসেনি জয়ন্তী। মীরাটের মানুষকে ভালভাবেই বিদায় করে দেবার জন্য তৈরী হয়ে আছে ওর মন।

কমলেশ হাসে—মীরাটে যাবার আগে আপনার কাছে আমারও যে একটা কীর্তি দেখাবার ইচ্ছে আছে।

জয়ন্তী—বলুন।

কমলেশ—দেখবেন তো?

জয়ন্তী—নিশ্চয়।

কমলেশ—আমার সঙ্গে টেনিস খেলবেন।

জয়ন্তী হেসে লুটিয়ে পড়ে—ওরে বাবা! গ্রাসগোর ব্লু, তার সঙ্গে টেনিস খেলতে গিয়ে শেষে কি…।

কমলেশ—আপনার খেলা দেখবার জন্য আমার কোন লোভ নেই। আপনি আমার খেলার কেরামতিটা একটু দেখবেন, এই লোভ?

জয়ন্তী—তারপর?

কমলেশ হাসতে থাকে—তারপর যদি ইচ্ছে হয় তবে একটা

চিঠিতে জানিয়ে দেবেন, আমার টেনিসের হাত ভাল লাগলো কি না।

গম্ভীর হয়ে জয়ন্তী—প্রতিশোধ নিতে চান, তাই না?

কমলেশের মুখের চেহারা হঠাৎ করুণ হয়ে ওঠে—না জয়ন্তী, ক্ষমা চাই।

চমকে ওঠে জয়ন্তী—আমার কাছে ক্ষমা চাইছ! কি অপরাধ করেছ তুমি?

কমলেশ—ঠিক বুঝতে পারছি না, তাই বলতে পারছি না।

কাছে এগিয়ে আসে জয়ন্তী। শান্ত অথচ উজ্জ্বল ছুটি চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—বল। কি বুঝতে পারছো না?

কমলেশ—তোমাকে সত্যিই ভালবাসি কিনা বুঝতে পারছি না।

—সত্যি কথাই বলেছ। থর থর স্বরে কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে নেয় জয়ন্তী।

কথা বলতে গিয়ে গলার স্বরটাকে চেপে দেয় কমলেশ—তুমিও তো সত্যি কথাটা বলতে পার।

জয়ন্তী—আমিও যে বুঝতে পারছি না। মিথ্যেই তোমাকে ক'দিনের জন্য কাছে ডেকে এনে শেষে অপমান করতে হলো!··· ···কিন্তু একটি কথা বলবো কি?

কমলেশ—বল।

জয়ন্তী—আমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে তোমার?

কমলেশ—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার?

জয়ন্তী—হ্যাঁ।

কমলেশ—তা হ'লে আমার আর কোন দুঃখ নেই।

জয়ন্তী হাসে—তা হ'লে চা খেয়ে যাও।

[সাত]

প্রজাপতির পাখার পরাগে বোধ হয় একটু ধুলোর ভেজালও থাকে। নইলে এত জানাজানির পর, এবং সেই জানাজানির এক একটি হর্ষ আবেগ ও স্পর্শকে এত ভাল লাগবার পর, আর ভাল লাগাবার মত কি বাকি থাকে যে, চিরজীবনের সঙ্গী হবার জন্য দুটি প্রাণের মধ্যে কোন আকুলতা পাগল হয়ে ওঠে না?

ভালবাসতে ইচ্ছা করে। প্রশ্ন হলো, কেন, ভালবাসবো? এত দেখা শোনা ও জানার পরেও যে এমন একটা প্রশ্ন দু'জনের জীবনের মাঝখানে ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এও তো একটা দুর্বোধ রহস্য। কমলেশের মন আর বুদ্ধি এই রহস্যের টেকনোলজি ধরতে পারে না। জয়ন্তীর মনের ফিলসফিও বোধহয় এই রহস্যের কুলকিনারা করতে পারে না।

মীরাট যাবার তারিখটা এগিয়ে দিতে চায় কমলেশ। ঠিক কবে রওনা হবে, তাও অবশ্য ঠিক করতে পারে না। তবে আজ নয়, কালও নয়।

এই রকমেরই বেঠিক মনের অবস্থার মধ্যে, পথে বেড়াতে বের হয়ে, হঠাৎ একদিন কলকাতার বন্ধু মাধবের ডাক শুনে চমকে খুশি হয়ে ওঠে কমলেশ।

মাধব বলে—দার্জিলিং-এ আমাদের যে একটা বাড়ি আছে, তা তুমি জানতে না?

কমলেশ—না।

মাধব—তবে চল। এখনি চল। আমি মাত্র আজকের দিন-

টাই এখানে আছি। ভাগ্যিস তোমার কাকার সঙ্গে ম্যাল-এ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনিই বললেন, তুমি বেশ কিছুদিন ধরে এখানে আছ।

মাধবদের বাড়িতে যেতে বার্চহিল রোডটাকে পার হতে হয়, এবং গল্প করতে করতে জয়ন্তীদের বাড়ির গেটের সম্মুখটাও পার হয়ে যেতে হলো। দেখতেও পাওয়া যায়, জয়ন্তীর যত্নের অর্কিড লনের চারদিকে রঙীন হাসির স্তবক ফুটিয়ে রেখেছে।

মাধব বলে—এই বাড়ির মেয়েকে কখনো চোখে পড়েছে?

কমলেশ চমকে ওঠে—হ্যাঁ, অনেকবার।

মাধব—দেখলে কিন্তু ঐ মেয়েকে কিছুই চেনা যায় না।

কমলেশ হাসে—তা তো বটেই। দেখে আর কতটুকু চেনা যায়?

মাধব—আমরা কিন্তু ওকে বেশ চিনি। তার কারণ ওর সবই জানি।

মাধবদের বাড়ির বারান্দার উপর উঠে চেয়ারে বসতেই মাধব চা আনবার জন্য খানসামাকে একটা হাঁক শুনিয়ে দিয়ে যেন একটা নির্মম অজাগতিক বিস্ময়ের গল্প গড়গড় করে বলতে থাকে।—ঐ মেয়ে, সে আজ প্রায় ছ-সাত বছর আগেকার কথা, কোন্ এক স্টেটের এক প্রিন্সের সঙ্গে খুব ভাব করেছিল। আমি নিজে দেখেছি, এই পথ দিয়ে সেই প্রিন্স বন্ধুর সঙ্গে একই গাড়িতে বসে জয়ন্তীও শিকার থেকে ফিরছে।

—শিকার ক'রে? কমলেশের মনের ভিতরে একটা রঙীন আর মায়াময় রূপকথা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

মাধব বলে—হ্যাঁ, শিকার করে; দস্তুর মত বন্দুক দিয়ে গুলি ক'রে মেরে রঙীন রঙীন পাখীর এক একটা বোঝা নিয়ে ওরা

ফিরতো। একদিন দেখলাম, এক জোড়া কাকার হরিণ, অর্থাৎ বার্কিং ডিয়ারের রক্তমাখা চেহারা গাড়ির কেরিয়ারে বাঁধা রয়েছে। ...যাই হোক, এসব কাজের জন্য কোন নিন্দে করছি না। অতুলবাবু ভয়ানক দুঃখ পেয়েছিলেন যেজন্য, সেটা হলো...।

চা আসে। চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে মাধব বলে—সেই শিকারী প্রিন্সটার সঙ্গে একদিন সিঞ্চল ডাক বাংলোতে রাত কাটিয়ে ঐ মেয়ে সকাল বেলা বাড়ি ফিরে এসেছিল।

চা-এর কাপে চুমুক দিতে গিয়ে ভুল ক'রে যেন একটা কামড় দেয় কমলেশ। হাতটা কাঁপতে থাকে।

মাধব বলে—এমনিতে সত্যিই অসাধারণ শিক্ষিত আর গুণী বটে অতুলবাবুর ঐ মেয়ে, তবু কি অদ্ভুত ব্যাপার জান, ঐ মেয়েই একদিন নিজের হাতে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে বুড়ো একটা সাধুকে বাড়ির বারান্দা থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। আমার বোন শিউলি তখন ওদের বাড়িতেই বেড়াতে গিয়েছিল। সেই বিশ্রী ব্যাপার দেখে শিউলিটা একেবারে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ফেলেছিল।

কমলেশ—সাধুটা কোন বাজে কথা-টথা বলেনি তো?

মাধব হাসে—তেমন বাজে কথা কিছু নয়। বলেছিল যে, তুমি যার সঙ্গে প্রীত করতে চাও মিস সাহেব, সেও তোমাকে খুব প্রীত করে। জয়ন্তীর এই মেজাজের আসল কারণ এই যে ··

চা-এর কাপ নামিয়ে রেখে মাধব বলে—দেখতে খুব সুন্দর বলে প্রচণ্ড একটা অহংকার আছে, আর মনে করে যে, ওকে ভালবাসতে চাইবে না, এহেন মানুষই নেই পৃথিবীতে। অথচ...।

চুপ করে এই অজাগতিক গল্পের অঢেল গ্লানির প্রবাহটাকে যেন একটু থামিয়ে রাখে মাধব। সিগারেট ধরায় তারপরেই বলে, অথচ, ওর হার্টে বিশ্রী একটা ব্যথা আছে। অতুলবাবু সেইজন্য খুবই দুশ্চিন্তা করেন।....এইবার বল কমলেশ। কি-রকম টেক-

নোলজি চালাচ্ছো? তোমার মা ভাল আছেন? বড়দা এখনো প্র্যাকটিস করছেন নিশ্চয়?

মাধবের সব প্রশ্নেরই উত্তর দেয় কমলেশ। উত্তরগুলি পিষ্টন ভাঙ্গা মেশিনের শব্দের মত মাঝে মাঝে যেন খাং-খাং করে আর্তনাদ করে ওঠে।

আরও গল্প হয়। মাধবদের বাড়ির চারদিকে ঘুরে ফিরে, উপরতলার মেঝের নতুন মোজায়িক দেখে, আর হলদে গোলাপের ঝাড় দেখে, তারপর যেন অচল ইঞ্জিনের মত স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কমলেশ।

—এখন তাহলে চলি মাধব। ক্লান্ত বিকৃত ও ধিক্কৃত একটা চেহারা নিয়ে, আস্তে আস্তে হেঁটে, অন্য পথে ঘুরে বাড়ি ফিরতে থাকে কমলেশ, যে-পথ থেকে বার্চহিল পার্কের কোন সবুজের ছায়াও চোখে পড়ে না।

বাড়িতে ঢুকতেই কাকিমা বলেন—শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করলি?

কমলেশ—কিসের ঠিক?

কাকিমা—মীরাটে যাবার আগে যদি একটু স্পষ্ট করে বলে যাস, তবে ভাল হয়।

চেঁচিয়ে ওঠে কমলেশ—কি শুনতে চাও?

কাকিমা—অতুলবাবু যদি তোর কাকাকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করে বসেন, তবে কিছু একটা উত্তর দিতে হবে তো।

কমলেশ—বলে দিও, বিয়ে হবে না, হতে পারে না।

কাকিমা—হতে পারে না কেন?

কমলেশ—ইচ্ছে করে না, ঘেন্নাও করে।

কাকিমা—কথাটা কদিন আগে বললেই পারতিস। তবে আমরাও মিছিমিছি···। কথাগুলি বেশ একটু উত্তপ্ত স্বরে বলতে বলতে চলে গেলেন কাকিমা।

আলেয়া হলেও ভাল ছিল। কমলেশের চোখ দুটো সেই আবু পাহাড় থেকে শুরু করে এই দার্জিলিং পর্যন্ত একটা অপচ্ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। জ্বলছে চোখ দুটো। জীবনের সব আনন্দের ভস্মের উপর যেন একটা হিংস্র ঠাট্টা গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে। জুয়াচুরির রূপও এত রঙীন হয়ে সেজে থাকতে পারে? সিঞ্চল ডাক-বাংলোতে শিকারী প্রিন্সের সঙ্গে রাত কাটানো একটা লোভের উচ্ছিষ্ট এমন লজ্জাবতীর ঢং ধরে থাকতে পারে? হার্টের মধ্যে বিশ্রী ব্যথা পুষে রেখে একটা শরীর এমন সুস্থ সুন্দরতার ভঙ্গীও ধরে?

বেঁচে গিয়েছে কমলেশ। এতদিনের সব অঘটনের মধ্যে মাধবের সঙ্গে এই হঠাৎ দেখাটাই হলো একটা আশীর্বাদ। ফুলে ঢাকা একটা ডাস্টবিনকে রূপকথার নীড় বলে মনে করেছিল কমলেশ।

জলাপাহাড় রোডের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে নিজের ভুলগুলিকে যেন প্রাণ ভরে ঘৃণা করে করে শান্ত হতে চেষ্টা করে কমলেশ। যেন হেসে হেসে এই ক'দিনের ইতিহাসকে একটা ধিক্কার দিয়ে মীরাটে চলে যাওয়া যায়।

যাবার আগে ঐ মেয়ের হাতের আঁকা যত রঙীন রাবিশের উপর থুতু ছড়িয়ে দিয়ে চলে আসলে কেমন হয়? টেনিস খেলবার নাম করে ডেকে এনে খুব স্পষ্ট করে একবার বলে দিলে হয়, পৃথিবীর যত জীবজন্তুর মধ্যে তোমাকেই সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য বলে মনে করি।

[আট]

ভক্তি পিসিমা তাঁর ছেলে-পিলেদের এখানে রেখে এখন শুধু একাই কার্সিয়ং-এ ফিরে যাবেন। উল বুনতে বুনতে মোটর গাড়িতে উঠে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন ভক্তি পিসিমা। তারপর ঘুমোতে ঘুমোতে বললেন—ওরা সব রইল জয়ন্তী। আমি অন্তত দশটা দিনের মধ্যে এদিকে আর আসতে পারবো না।

চলে গেলেন পিসিমা। জয়ন্তীর মনে পড়ে, আর মনে পড়তেই নিঃশ্বাসটা এলোমেলো হয়ে যায়, কবে মীরাট রওনা হবে কমলেশ? কম নয় তো, তিনটে দিন পার হয়ে গেল, আর আসেনি কমলেশ। ভালবাসতে চায় যে মানুষ, সে এরকম চেষ্টা করে দূরে সরে থাকে কেন?

নিজের ভুলটাও যেন মনে পড়ে যায়। এই অভিযোগ কমলেশও তো করতে পারে। জলাপাহাড় রোডের বাড়িতে আর যায়নি জয়ন্তী। পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবার আর কাছাকাছি বসবার আনন্দটাকেই ভয় পেয়ে সাবধান হতে হয়েছে। কিন্তু একবার গিয়ে, শুভা মাসিমার কাছে দাঁড়িয়ে সেই মানুষটির সঙ্গে দু-একটা কথা বলে আসতে দোষ কি?

একটা গাড়ি মিষ্টি স্বরের হর্ণ বাজিয়ে গেট পার হয়ে তরতর করে লাল কাঁকর মাড়িয়ে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াল। যে এসেছে তাকে চিনতে পারে জয়ন্তী, আর চিনতে পেরেই খুশি হয়ে হেসে ওঠে। ভক্তি পিসিমার দেবর নন্দবাবুর স্ত্রী সেই চিন্তনীয়া। চিন্তনীয়া জয়ন্তীর সিমলার বান্ধবীও বটে। পড়া ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ নন্দবাবুকে বিয়ে করে দিল্লী চলে গেল চিন্তনীয়া। তারপর থেকে আর দেখা নেই।

চিন্তনীয়া বলে—ভক্তিদি কি কার্সিয়ং ফিরে গেছেন ?

জয়ন্তী—হ্যাঁ, এই তো চলে গেলেন। বড় জোর একঘণ্টা হবে।

চিন্তনীয়া আক্ষেপ করে—ইস্, কি ভুলই হলো! ওখানে এতক্ষণ সময় নষ্ট না করলে ভক্তিদি'র সঙ্গে দেখাটা হয়ে যেত।

জয়ন্তী—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? নন্দবাবু কোথায় ?

চিন্তনীয়া—জলাপাহাড় রোডে মনতোষ-বাবুর বাড়িতে এতণক্ষ ছিলাম। উনি সেখানেই রয়ে গেলেন। উনি আজই চলে যাবেন। মনতোষ-বাবুর সঙ্গে ওঁর দিল্লী অফিসের কি একটা কাজ আছে।

জয়ন্তী—তা'হলে নন্দবাবুর সঙ্গে মনতোষবাবুর বেশ জানা-শোনা আছে ?

চিন্তনীয়া—আছে বৈকি। শুধু দিল্লী অফিসের কাজের সম্পর্কে নয়, মনতোষ বাবুর বড় ভাই পরিতোষবাবু, যিনি মীরাটে বাড়ি করেছিলেন, যিনি এখন আর নেই, তিনিই তো ওঁকে পার্টনার করে দিল্লীতে কারবার শুরু করেছিলেন। মরে যাবার আগে পরিতোষ-বাবু তাঁর স্বত্ব মনতোষ-বাবুর নামে ট্র্যান্সফার করে দিয়ে গেছেন।

জয়ন্তী—তা হলে ওদের সঙ্গে নন্দবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলতে হবে।

চিন্তনীয়ার গলায় স্বর হঠাৎ বড় বেশি মৃদু হয়ে যায়।—ঐ পরিবারের অনেক খবর উনি জানেন। বিশেষ করে যার সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, সে'ও দেখলাম এখন ঐ বাড়িতে আছে।

জয়ন্তী—কার কথা বলছো ?

চিন্তনীয়া—মনতোষ-বাবুর ভাইপো; পরিতোষ-বাবুর ছেলে কমলেশ, ইঞ্জিনিয়ার; দার্জিলিং-এ বেড়াতে এসেছে। কি আশ্চর্য, ওকে দেখলেই আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে জয়ন্তী।

জয়ন্তী—কেন ? ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ নাকি ?

চিন্তনীয়া—না, এমনিতে স্বভাবটা খুবই ভদ্র, কোন নিন্দে করা যায় না, কিন্তু ভেতরে অনেক গলদ আছে।

জয়ন্তী যেন দম বন্ধ করে কোনমতে প্রশ্নটাকে উচ্চারণ করে —তার মানে?

চিন্তনীয়া—গলদ আছে বলা ঠিক নয়। গলদ ছিল। এখন অবশ্য…তা'ও বলতে পারি না জয়ন্তী, কার ভেতরে কি থাকে।

জয়ন্তী ভ্রূকুটি করে, আর, যেন একটা দুঃসহ চিৎকার চাপা দিতে চেষ্টা করে।—চোর-ডাকাত বোধ হয়?

চিন্তনীয়া হেসে ফেলে - না না, চোর-ডাকাত কেন হতে যাবে? হ্যাঁ, তবে একটা কাণ্ড করেছিল বটে।

জয়ন্তী—কিসের কাণ্ড?

চিন্তনীয়া—আই-এ পরীক্ষাতে ম্যাথমেটিক্‌সের পেপারটা বই দেখে বেপরোয়া চুরি করে লিখেছিল। ধরাও পড়েছিল। এক্স-পাল্‌শনের অর্ডারও হয়েছিল। আমার শ্বশুর তখন বেঁচে, তিনিই এদিকে-ওদিকে অনেক ধরাধরি করে কমলেশকে সে-যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

জয়ন্তী হাসে, হাসিটা ধিক্কারের মত। —তাহলে চুরি বিদ্যে দিয়েই বিদ্যে শুরু করেছিল?

চিন্তনীয়া—যাই হোক্, বিলেত গিয়ে কিন্তু বিদ্যেতে ভালই বাহাদুরী দেখিয়েছে। তবে সেই সঙ্গে ঐ সেই বিদ্যেটি নিয়ে ফিরে এসেছে।

জয়ন্তী—কোন অবিদ্যা নিশ্চয়।

চিন্তনীয়া —হ্যাঁ, মদ খায়। দেখতে তো সত্যিই সুপুরুষটি, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রং, কিন্তু পেটে কি-রকমের একটা আলসারও আছে শুনেছি। উনিই বলেছিলেন।

জয়ন্তী—এর চেয়েও ভাল গুণটুন আর কিছু নেই?

চিন্তনীয়া লজ্জায় জিভ কাটে,আর ফিসফিস করে বলে—ছিল। সে-ও এক কেলেঙ্কারির ব্যাপার। কমলেশেরই এক বন্ধুর স্ত্রী আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

জয়ন্তী রুমাল দিয়ে উত্তপ্ত কান দুটো মুছতে চেষ্টা করে।—কেন ?

চিন্তনীয়া—ভালবাসা।

জয়ন্তী—কে কা'কে ভালবেসেছিল ?

চিন্তনীয়া—তা জানি না ভাই। উনি বলেছিলেন, দু'জনেরই সমান দোষ। সে যাত্রাও আমার শ্বশুর অনেক চেষ্টা করে কমলেশকে মস্ত একটা অপমানের মামলা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। যাক, পরনিন্দা অনেক হলো, এখন তোমার নিন্দা একটু করি।

জয়ন্তীর ঠোঁট দুটো কলের পুতুলের ঠোঁটের মত কেঁপে ওঠে—কর।

চিন্তনীয়া—তুমি বছরের মধ্যে একটা চিঠি দেবারও কি সময় পাও না ?

জয়ন্তী—সময় পাই, কিন্তু…।

চিন্তনীয়া—খবর দেবার মত কিছু পাও না ?

জয়ন্তী—খবর আছে, কিন্তু সেটা আর তোমাকে জানিয়ে লাভ কি ?

চিন্তনীয়া—অ্যাঁ ? আমাকে জানাবে না ? বলছো কি জয়ন্তী ? আমি যে আশায় আশায় শুধু দিন গুনি, এই বুঝি তোমার খবর এল।

জয়ন্তী—খবরটা এই যে, বুকের ভেতর বিশ্রী একটা ব্যথা দেখা দিয়েছে, অথচ মরছি না।

চিন্তনীয়া—ছিঃ, ওরকম করে বলো না জয়ন্তী। সত্যি, ভাল খবর কিছু নেই ?

জয়ন্তী—থাকলে জানতেই পারতে।

চিন্তনীয়া—আজ তাহলে চলি জয়ন্তী।

জয়ন্তী—দার্জিলিং-এ আরও কিছুদিন থাকছো তো?

চিন্তনীয়া—না ভাই। কালই চলে যাব শিলিগুড়ি। তারপর বাঘডোগরা হয়ে সোজা বাই এয়ার দিল্লী পাড়ি দেব।

চলে গেল চিন্তনীয়া। আর, জয়ন্তী দু'চোখের উপর রুমাল চেপে নিঝুম হয়ে ড্রইং রুমের নিভৃতে একটা মরা রঙীন পাখির মত পড়ে থাকে।

সুপারম্যান! হ্যাঁ, সুপারম্যানই বটে। নীৎসের সুপারম্যানও এই কাহিনী শুনলে ঘৃণায় শিউরে উঠবে। লোকটা দার্জিলিং-এ এসে যেন জয়ন্তীর জীবনটাকে ভুলিয়ে কাছে নিয়ে গিয়ে খুন করবার চেষ্টায় এত দিন ধরে ঘুরঘুর করেছে। সেই আবু পাহাড় থেকে এক সাংঘাতিক শ্বাপদের মতলব যেন জয়ন্তীর ছায়া শুঁকে শুঁকে দার্জিলিং পর্যন্ত তাড়া করে এসেছে।

নিজের মূর্খ চোখ দুটোকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে। আর ঘৃণা করতে হয়, নিজেরই মনের যত স্বপ্ন, আর এই এত সাবধানী দেহটার যত ভুলগুলিকে। ভাবতে গেলে নিজেরই বুকটাকে নখ দিয়ে আঁচড়ে সব নোংরা নিঃশ্বাস বের করে দিতে ইচ্ছা করে। ঐ লোক্‌টারই হাতে হাত রেখেছিল জয়ন্তী। ভাল লেগেছিল ঐ লোকটার স্পর্শ?

মীরাট চলে যাবে বলে বার বার মায়া ছড়াতে এসেছে। জয়ন্তীর হাতের আঁকা ছবি দেখতে চায়, আর জয়ন্তীর সঙ্গে টেনিস খেলতে চায়। মতলবের জাল পেতে জয়ন্তীর জীবনটাকে মাতাল লোভের জন্য চিরকালের একটা খোরাক যোগাড় করতে দার্জিলিং-এ এসেছে মনতোষবাবুর ঐ ভাইপো।

মানুষের উপরটা এত ভাল, আর ভিতরটা এত পচা হয় কি করে? যাক, এতদিনে চিনতে পারা গেল লোকটাকে।

কিন্তু, পোড়া সাপের মত ছটফট করে উঠে দাঁড়ায় জয়ন্তী। লোকটাকে প্রাণ ভরে অপমান না করা পর্যন্ত যে মনের এই জ্বালা নিভবে না। সে সুযোগ পাওয়া যাবে তো? ছবি দেখবার অছিলা করে সত্যিই একবার আসবে তো? না, বার্চহিল রোডের বাতাস থেকেই বিপদের গন্ধ পেয়ে পালিয়ে যাবে ধূর্ত লোভের এই প্রাণীটা?

জয়ন্তীর গায়ের শাড়িটা ক্রুদ্ধ তিব্বতী কালিজের রঙীন পালকের মত যেন ফেঁপে আর ফুলে ফুলে কাঁপছে। তারপরেই সব অস্থিরতা যেন একটা অবসাদ হয়ে সারা শরীরটাকে অবশ করে দেয়। এখনি রাংতুন চলে যাওয়া যেত, যদি ভক্তি পিসিমা এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চাকে গছিয়ে না দিয়ে যেতেন।

চুপ করে বসে এই বঞ্চনাকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা করে জয়ন্তী। আশাটাই ঠকেছে, জীবনটা ঠকেনি। ঠিক সময় বুঝে ভাগ্যেরই একটা কৃপার মত চিন্তনীয়া আজ এসেছিল, তাই লোকটাকে চিনতে পারা গেল। আর, আরও ভয়ানক ভুল থেকে জীবনটা বেঁচে গেল।

লোকটার উপর আর রাগ করাও উচিত নয়। রাগ করলেই যে ওকে সম্মান দেওয়া হয়। যার ঐ চেহারার ভিতরে আল্সার লুকিয়ে আছে, যার বুকের ভিতরে পুরনো ভালবাসার ক্ষত লুকিয়ে রয়েছে, যে বিদ্বানের জীবনে একটা চুরির ইতিহাসও আছে, তার উপর রাগ করলে যে নিজেকেও ছোট করা হয়।

সত্যিই মনটা এতক্ষণে যেন সব জ্বালা তাড়িয়ে দিয়ে, সব আক্ষেপের ভার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শান্ত আর হালকা হয়ে ওঠে। শুধু নিজের শরীরটাকে বড় ময়লা বলে মনে হয়।

স্নান সেরে এসে, যেমন রোজ সন্ধ্যায় মনের মত ক'রে সাজে জয়ন্তী, এই সন্ধ্যাতেও তাই করে। আবু পাহাড়ের সেই দেখার ভুল থেকে সুরু করে এই দার্জিলিং-এর যত শোনার ভুল আর জানার ভুল পর্যন্ত সব ভুলের ক্ষতি যেন মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এইবার নিজের জগতের কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার জন্য তৈরী হয় জয়ন্তী।

শেল্‌ফ থেকে বই টেনে নিয়ে স্পিনোজার শেষ ভল্যুমের উপর চোখের সঙ্গে মন ঢেলে দিয়ে পড়তে থাকে।

ঠিকই, মানুষ বড় দুঃখ দেয়। তার চেয়ে অনেক ভাল, অনেক নিরাপদ ঐ পাখির মেলা, খরগোসের জ্বলজ্বলে রুবির মত লাল চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি, অর্কিডের হাসি, আর পাগলাঝোরার জল। একা একা পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন স্পিনোজা। একটি গাছের ছায়া দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই গাছটি হলো কমলালেবুর গাছ। সে গাছ ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে। গাছের একটি শাখা হঠাৎ হাওয়ায় দুলে উঠলো। ফুলে ভরা সেই শাখা স্পিনোজার কান ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলতে থাকে। হেসে উঠলো স্পিনোজার মুখ। আর, একটা কান কমলালেবুর ফুলের কাছে আরও এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলতে থাকেন স্পিনোজা—বুঝেছি, বুঝেছি, কি বলতে চাইছ মাই ডিয়ার ফ্লাওয়ার?

পড়তে পড়তে জয়ন্তীরও সারা মুখে সুন্দর একটি তৃপ্তির হাসি যেন আভা জাগিয়ে ফুটে ওঠে। মানুষের মুখের কাছে কোন আশা নিয়ে কান পাতলেই ভুল করা হয়। কমলালেবুর ফুলের নীরব কথার অর্থ জানেন স্পিনোজা।

বই-এ সেটা লেখা নেই। জানতে ইচ্ছা করে জয়ন্তীর। মানুষের কথা বিশ্বাস করো না, স্পিনোজাকে এই কথাটিই বোধ হয় বলেছিল পথের ধারে সেই কমলালেবুর গাছের ফুল।

হঠাৎ বই বন্ধ করে জয়ন্তী। যে মানুষটাকে সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস করা উচিত, সেই মানুষটাই একটা ভয়ানক অহংকারের মূর্তি ধরে, চোয়াল শক্ত ক'রে, জোরে জোরে পা ফেলে এই বারান্দার দিকে আসছে।

জয়ন্তীর শান্ত মূর্তিটা একটুও কাঁপে না। যেন নিরেট পাথর হয়ে, শুধু একটি প্রশ্নকে মনের মধ্যে শানিত করে নিয়ে চুপ করে দেখতে থাকে জয়ন্তী। আসছে আসুক। সুযোগ পাওয়া গেলে শুধু একটি কি দুটি কথা বলে দিতে হবে। কিন্তু কি কথা বললে এই মুহূর্তে ঐ শক্ত চেহারা ধরা-পড়া চোরের মত ভীরু কাতর ও করুণ হয়ে পালিয়ে যাবে ?

কমলেশ এসে বারান্দার উপর ওঠে, কিন্তু চেয়ারে বসে না। জয়ন্তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

কমলেশ বলে—আপনার হাতের আঁকা ছবি দেখতে আসিনি। আপনাকে টেনিস খেলবার জন্য নেমন্তন্ন করতেও আসিনি। শুধু জানিয়ে যেতে এসেছি যে, আপনাকে চিনেছি।

জয়ন্তীও তার পাথরের মত শক্ত ও কঠোর মূর্তিটাকে টান করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়।—আমাকে চেনবার সাধ্যি আপনার নেই।

--চিনেছি। চেঁচিয়ে ওঠে কমলেশ। শিকারী প্রিন্সের সঙ্গে ডাক বাংলায় রাত কাটিয়েছেন যিনি, তাঁকে চিনেছি।

থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে জয়ন্তী। শক্ত ও কঠোর পাথুরে ভঙ্গীর মূর্তিটা যেন এক মুহূর্তে ঘূণ ধরে ঝরে পড়ে যাবে। ঝুপ করে চেয়ারের উপর বসে পড়ে জয়ন্তী। দু'হাত তুলে চোখ ঢাকে, আর বুকটা যেন থেকে থেকে ধুঁকতে থাকে।

কমলেশ বলে—চেহারাটাকে নিয়ে আর এত ঢং করবেন না। বুকের বিশ্রী ব্যথাটা বেড়ে যাবে।

আস্তে আস্তে চোখ তোলে জয়ন্তী—এ খবরটাও তাহলে পেয়ে গিয়েছেন ?

কমলেশ—আরও অনেক কিছু জানবার সৌভাগ্য হয়েছে।

বেশ শান্ত অথচ উদাস স্বরে, হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে জয়ন্তী—বলুন, আর কি জানতে পেরেছেন ?

কমলেশ—ফিলসফার মেয়ে একটা বুড়ো মানুষকে চাবুক তুলে মারতে যায়। মেয়ে-জাতের মানুষ হয়েও নিষ্ঠুর ফুর্তি ক'রে হাসতে হাসতে রঙীন পাখী শিকার করে আনে। সুন্দর রূপকথা যে এমন একটি কুৎসিত নর্দমার কথা, সেটা কোনদিন কোন সন্দেহের ভুলেও ভাবতে পারিনি, তাই তার হাত···

জয়ন্তী বলে—বলুন, আর কি বলবার আছে ?

কমলেশ—আর কিছু বলবার দরকার হয় না।

জয়ন্তী—বেশ। কিন্তু আমার একটি কথা বলবার আছে।

কমলেশ—কি কথা ?

জয়ন্তী—আমাকে চিনতে পেরেছেন, ভালই হয়েছে। তবে আর এত রাগ করছেন কেন ? এখন খুশি হয়ে চলে যান।

কমলেশ—নিশ্চয়। খুশি হয়েই চলে যাচ্ছি। সে-কথা আর কষ্ট করে বলতে হবে না।

জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি, অতি উচ্চশিক্ষিতা আর চমৎকার সৌজন্যের ও শোভনতার নিয়মে অভ্যস্ত এক নারীর চোখের দৃষ্টি কী অদ্ভুত রূঢ় হয়ে কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন একটা প্রতারকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জয়ন্তী। জয়ন্তীর চোখের এই চাহনিতে যেন একটা তীব্র জ্বালা ছটফট করছে। জয়ন্তী বলে—আমিও খুশি হয়েই বলছি, কষ্ট করে বলছি না।

—কি বলছেন ?

—বলছি, যে মানুষ তার বন্ধুর স্ত্রীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী,

যার জীবনে বিশ্রী স্ক্যাণ্ডালের দাগ আর মামলার দাগ রয়েছে, তার পক্ষে জোরগলায় চেঁচিয়ে কথা বলা একটুও মানায় না।

—কী বললেন? তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কমলেশ।

—না বোঝবার ভান করবেন না, যা শুনেছি, যা সকলেই শুনেছে ও জেনেছে, সেই কথাই বলছি। পেটের ভিতরে আলসার পুষে রাখা, মদে ডুবে থাকা আর স্কুলের জীবনে বিস্থা-চুরির গল্পটিকে চাপা দিয়ে রাখা বড় রকমের চালাকি হতে পারে। কিন্তু বড়-রকমের মনুষ্যত্ব নিশ্চয় নয়।

কমলেশের মূর্তিটা যেন একটা পাথর। উত্তর দেয় না, প্রতিবাদ করে না কমলেশ।

আর এক মিনিটও দেরি করে না কমলেশ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফটকের দিকে তাকায়; তারপরেই যেন আগুনের জ্বালা লাগা একটা আতঙ্কিত মানুষের মত যন্ত্রণার্ত অথচ করুণ মূর্তি নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়।

[নয়]

আর কি বাকি রইল ? দেখা, শোনা, জানা আর চেনা হয়ে গিয়েছে। এর পরেও, জীবনের এতবড় একটা বৃথা হয়রানির পর, একেবারে খাঁটি ও সত্য একটা ফাঁকির কৌতুক চরমে উঠবার পর কমলেশের পক্ষে মীরাট রওনা হয়ে যেতে আর দেরী করার কোন অর্থ হয় না। জয়ন্তীরও পক্ষে অন্তত কিছুদিনের জন্য রাংতুনের বাগানে চলে যাওয়া উচিত। ভক্তি পিসিমার কাচ্চা-বাচ্চাগুলিকে কার্সিয়ং পৌঁছে দিয়ে আসতেই বা কতক্ষণ লাগে ?

জয়ন্তীর খবর রাখে না কমলেশ, রাখবার কোন অর্থও হয় না। নিজের খবর ঠিক রাখতে পারলে হয়।

কাকিমা এসে বলেন—সত্যিই কি কাল মীরাট চলে যাবি ?

কমলেশ—না।

কাকিমা শুনে খুশি হন।—আমিও তাই বলি। কিন্তু যে-রকম গোঁ ধরেছিলি তুই, বলতে ইচ্ছেই হচ্ছিল না।

কাকিমা চলে যেতেই চমকে উঠে নিজের মনটাকে সন্দেহ করে কমলেশ। এ কি ? সত্যিই যে নিজেরই খবর ঠিক রাখা যাচ্ছে না। মীরাটে চলে না গিয়ে এখন আর দার্জিলিং-এ পড়ে থাকবার দরকার কি ?

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জলাপাহাড় রোডের এই বাড়ির এই ঘর আর ও-ঘরের ভিতরে, বড় জোর বাগানের এক নিরিবিলির মধ্যে প্রহরের পর প্রহর অবাধে কাটিয়ে দিয়ে, তারপর সারারাত ধরে অঘোরে ঘুম। ইঞ্জিনিয়ার কমলেশের জীবনের ইঞ্জিন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জলাপাহাড় রোডের কোন পাইনের

ছায়ার কাছে, ভিক্টোরিয়া ওরাটারফল্সের কোন কলহর্ষের কাছে আর একলা গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হয়। যায় না কমলেশ।

নিখুঁত রূপকথা আশা করতে গিয়ে এবং হাতের কাছে পেয়েও দেখা গেল যে, সে রূপকথার ভিতরে ক্ষত আছে।

ফিলসফারের মত গবেষণা করছে কমলেশের মন।

চিনতে পেরে ভালই হলো। এই ভয়ানক চেনার আঘাতটাকেও যে ভালই লাগছে। মনে হয়, একটা বাধা সরে গিয়েছে।

এই সবই তো কতগুলি কল্পনার ফিলসফি। মানুষের বাস্তব জীবন বড় হিসেবী। আমদানির বেলায় নিখুঁত জিনিস খোঁজে, রপ্তানির বেলায় দাগী জিনিস। জয়ন্তীও এই হিসাবের বাইরে যাবে কেন? বেশ স্পষ্ট করে হেসে হেসে যে মেয়ে বলতে পারে—খুশি হয়ে চলে যাও, সে মেয়ের মনও হিসাব খুব ভালই বোঝে।

একটা স্বপ্নালু চিন্তা হঠাৎ অতি রূঢ় শক্ত ও বাস্তব একটা প্রশ্ন দিয়ে কমলেশকে যেন চেপে ধরে। জয়ন্তী যদি এই মুহূর্তে এসে বলে, তোমারই সঙ্গে মীরাট চলে যেতে চাই, তবে?

কাকিমা যদি হঠাৎ এসে বলেন—অতুল-বাবু রাজি, জয়ন্তীও রাজি আছে। বিয়ে করে জয়ন্তীকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে মীরাট চলে যা কমল, তবে?

বাড়ির বাইরে বের হয়ে জলাপাহাড় রোডের বাতাস গায়ে লাগিয়ে মনের এই শক্ত প্রশ্নটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে কমলেশ। কিন্তু মনের উত্তরটা অশান্ত হয়ে যায়। না, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে লাভ নেই। জয়ন্তীকে চিরকালের সঙ্গিনী করে জীবনের পাশে ধরে রাখবার জন্য মনে কোন লোভও নেই। বরং, ভাবতে বেশ একটু ঘৃণাই বোধ করে কমলেশ।

কোথা থেকে আর কেমন করে কমলেশের জীবনের সেই কবেকার গল্পগুলি শুনতে পেল জয়ন্তী? এই প্রশ্নও মাঝে মাঝে

কমলেশের এই ক্লান্ত ভাবনাগুলিকে আশ্চর্য করে দেয়, হাসিয়েও তোলে। যেখান থেকে আর যার কাছ থেকেই শুনুক, কী ভয়ানক একটা মিথ্যেকে শুনেছে জয়ন্তী। মনে হয়, ঐ যে সেদিন হঠাৎ কোথা থেকে এই বাড়িতে এসে দেখা দিল যে মহিলা, মীরাটের মেয়ে, যার নাম চিন্তনীয়া, সেই মহিলাই বোধ হয় জয়ন্তীর কাছে গল্পগুলি বলেছে। কিন্তু ঐ তো সেই চিন্তনীয়া, যাক্ সে কথা; মানুষ বোধহয় নিজের জীবনের গল্পগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে লুকিয়ে রেখে পরের জীবনের গল্পগুলি বলে শিউরে উঠতে, আশ্চর্য হয়ে যেতে আর ঘেন্না করতে ভালবাসে। তা না হলে, চিন্তনীয়ার মত নারী কেন……।

মানুষের কাছে থাকাটাই বোধহয় মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় আপদ। এর চেয়ে লোহা আর ইস্পাতের কাছে বসে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ। ফার্নেস, ব্লোয়ার, ষ্টোকার ও ষ্টিম টার্বাইন, আর যাই করুক, গায়ে পড়ে ক্ষতি করে না। বয়লার আর জেনারেটর, আর যাই করুক, কাউকে ঘেন্না করে না। কলের ঝনঝনার মধ্যে নিষ্ঠুর ঠাট্টা নেই। এয়ার-ডাক্‌টের কাছে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে শরীরের জ্বালার মত মনের জ্বালাও জুড়িয়ে নেওয়া যায়।

ক'দিন থেকে কমলেশের রাতের ঘুমগুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর কারণও হলো একটা মানুষ।

কাকিমার পুরনো আয়া এক লেপচা বুড়ি। বুড়ির নিউমোনিয়া হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, বাঁচবার আশা খুব কম। কমলেশকে রাত জেগে এই লেপচা বুড়ির ঘরে বসে থাকতে হয়। বুড়ির নিঃশ্বাসের উপর পাহারা রাখতে হয়। চার্ট দেখে ঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হয়। এমন কি, বুকে একটা লিনিমেন্ট মালিশ করে দিতেও হয়। কাকা আর কাকিমা'র যা শরীর, তাতে তাঁদের

কারও পক্ষে এই রকম রাত-জাগা সেবার খাটুনি সম্ভব নয়।

বুড়িও যেন মরবার আগে অদ্ভুত এক খুশির বাতিকে পাগল হয়ে উঠেছে। কমলেশ ওষুধ খাওয়াবার জন্য কাছে গিয়ে বসলেই বুড়ি হেসে ওঠে, কেঁদে ফেলে, আবার মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলেই হাসতে থাকে। আর, সেই সঙ্গে, দু'হাত দিয়ে কমলেশের গলাটাকে শক্ত করে ধরে বুকের উপর টেনে নিয়ে ফোঁপাতে থাকে। বুড়ির খুশিভরা চোখের জলে কমলেশের গায়ের গেঞ্জি ভিজে যায়।

সকাল ন'টা পর্যন্ত লেপচা বুড়ি হেঁচকি তুলেছে, তারপর একটু শান্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। তাই কমলেশকে রাত-জাগা চোখের ক্লান্তি চোখে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে একটু বিশ্রাম খুঁজতে হয়।

বিশ্রাম বলতে ঐ; পশমী গেঞ্জি গায়ে দিয়ে, গরম আলোয়ান জড়িয়ে, চটি পায়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু ঘুরে বেড়ানো। এই সময় জলাপাহাড় রোডের গাছের ছায়া আর ঠাণ্ডা বাতাসকে ভালই লাগে। আস্তে আস্তে হেঁটে পথের উপর ঘুরে বেড়ায় কমলেশ। বুঝতে পারে, লেপচা বুড়ির একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত মীরাট রওনা হবার তারিখটা ঠিক করাই সম্ভব হবে না।

বাইরের ঘরে কাকিমার সঙ্গে কেউ যেন খুব জোরে হেসে হেসে কথা বলছে। কথাগুলিকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না; কিন্তু হাসির শব্দটাকে চিনতে পারা যায়। ওটা চিন্তনীয়ার হাসি।

সিমলার সেই মেয়ে চিন্তনীয়ার বিয়ে কবে হলো, কার সঙ্গে হলো, সে ইতিহাসের কিছুই জানে না কমলেশ। শুধু জানে কমলেশ, কদিন হলো চিন্তনীয়া দার্জিলিংয়ে এসেছে। কতদিন থাকবে, কে জানে।

কী আশ্চর্য, এবাড়িতে রোজই একবার না একবার আসে চিন্তনীয়া। এই সাতদিনের মধ্যে এমন একটিও দিন পার হয়নি, চিন্তনীয়া এ-বাড়িতে অন্তত একবার না এসেছে। চিন্তনীয়ার সঙ্গে

কয়েকবার মুখোমুখি দেখাও হয়েছে কমলেশের; কিন্তু কোন কথা বলেনি চিন্তনীয়া। বরং, চিন্তনীয়ার ব্যস্ততার রকম দেখে মনে হয়েছে যে, কমলেশকে যেন এই প্রথম দেখতে পেয়েছে, কিংবা একটা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা। তাই কোন কথা বলবার নেই। কমলেশের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে চিন্তনীয়া; যেন একটা অবাঞ্ছিত সান্নিধ্যের স্পর্শ থেকে সরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কমলেশ বিস্মিত হয়েছে, বেশ একটু অস্বস্তিও বোধ করেছে। কোন কথা বলতে চেষ্টা না করে কমলেশ এক দিকে সরে গিয়েছে। কাকিমা বরং চেঁচিয়ে কথা বলেছেন।—চিনতে পারছিস না কমল? অচেনা কেউ নয়; এ যে সিমলের সেই চিন্তনীয়া।

হাসতে চেষ্টা করে কমলেশ—জানি।

কিন্তু চিন্তনীয়ার চোখের দৃষ্টি তবু একটুও প্রসন্ন হয়ে ওঠেনি। কমলেশকে একটা চেনা মানুষ বলে স্বীকার করতে চিন্তনীয়ার মনে যেন একটা ভয়ানক আপত্তি আছে। কাকিমার কথার উৎসাহটাকে দমিয়ে দিয়ে চিন্তনীয়া শুধু বলে—খুব চিন্তায় আছি কাকিমা।

—কেন?

—আজ দু'দিন ধরে ওর কোন টেলিগ্রাম পাচ্ছি না।

—কিসের টেলিগ্রাম?

—কথা ছিল, রোজ অন্তত একটি টেলিগ্রাম করে জানাবে, এখন কোথায় আছে, আর কি করছে। পরশু সন্ধ্যাতে বিলিয়ার্ড খেলতে যায়নি, সে-কথাও টেলিগ্রামে জানিয়েছিল। অথচ, এই দু'দিন ধরে মানুষটার কোন খবর……।

কাকিমা হাসেন—এত সামান্য কারণে তুমি এত চিন্তা কর?

চিন্তনীয়া ব্যাকুল হয়ে হাসে—অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, কাকি-মা, কি করবো বলুন?

কাকিমা—নন্দ এখন কি করছে?

চিন্তনীয়া—কি আর করবে? ভাল ম্যানেজার পেয়েছে, মাত্র ন'শো টাকা মাইনে দিতে হয়। ম্যানেজার ভদ্রলোক কারবারের সব কাজ দেখা-শোনা করেন। আর উনি শুধু নতুন গাড়ির খোঁজ করে মাথা ঘামাচ্ছেন। শুধু আমার বেড়াবার জন্যে ছুটো টুরার কিনেছে। কত মানা করলাম, তবু শুনলো না।

এই সব কথা, আর শুধু এই ধরণের কথা ছাড়া আর কোন কথা চিন্তনীয়ার মুখে শোনা যায় না। তা ছাড়া, কত জোরে আর চেঁচিয়ে হেসে কথাগুলি বলে চিন্তনীয়া। কাকিমার এত কাছে দাঁড়িয়ে, কাকিমাকে শোনাবার হলে এত জোরে চেঁচিয়ে কথা বলার কোন দরকার হয় না। মনে হয়, চিন্তনীয়া যেন আর কাউকে কথাগুলি শোনাতে চাইছে।

সেদিন কাকিমা বাড়িতে ছিলেন না। নিশ্চয়ই জানতো না চিন্তনীয়া, কাকিমা এখন বাড়িতে নেই। কিন্তু এসেই যখন দেখতে পেল যে, বাড়িতে কাকা নেই, কাকিমাও নেই, তখন নিশ্চয়ই চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু চলে গেল না চিন্তনীয়া।

খানসামা বলে—মাইজীর ফিরতে তিন-চার ঘণ্টা হবে।

তবু ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে খানসামার সঙ্গে প্রায় পনের মিনিট ধরে কথা বলে চিন্তনীয়া।—আমাদের দেরাছুনের বাড়ির জন্য গত মাসে তিন হাজার টাকা দামের অর্কিড কেনা হয়েছে। সাহেব নিজে অর্কিড ভালবাসেন না, কিন্তু আমি ভালবাসি। অথচ, আমি কোনদিন ভুলেও একথা সাহেবকে বলিনি, তবু সাহেব যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারেন। হঠাৎ দেখলাম, একদিন মিসেস ফুলারের নার্সারি থেকে ছুজোড়া অদ্ভুত অর্কিড কিনে নিয়ে এলেন।

খানসামা খুশি হয়ে বলে—আহা, এই তো সাচ্চা রহিস মানুষ।

চিন্তনীয়া—খুব সত্যি কথা।

চলে গেল চিন্তনীয়া। চিন্তনীয়ার জীবনের একটা গর্ব যেন হেসে হেসে কথা বলে চলে গেল।

কাকিমা যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে।

আর কমলেশ তখন তার বাক্স, বেডিং আর ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে। যাবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কমলেশ।

কাকিমা আশ্চর্য হন—এ কি? বলা নেই কওয়া নেই, এখুনি কোথায় চললি?

—যাচ্ছি; মীরাটেই ফিরে যাচ্ছি।

—কেন? ছুটি তো এখনও ফুরোয়নি।

—না, ফুরোয়নি, কিন্তু আমাকে যেতেই হচ্ছে। না যেয়ে উপায় নেই।

[দশ]

কি আশ্চর্য, এমন অদ্ভুত, এমন মিথ্যে, অথচ এত স্পষ্ট স্বপ্ন মানুষে দেখতে পায়? শিলিগুড়ি পৌঁছবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল। ট্রেনের কামরায় জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় কমলেশ।

বার্চ হিল রোডের বাড়ির সেই বারান্দা আর লনের অর্কিড। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া যায়, বাড়ির ভিতরে যেন ছুটোছুটি, হাসাহাসি আর চেঁচামিচির একটা উৎসব চলছে।

জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা হবে। দু'একটা কথা বলতেও হবে নিশ্চয়; কিন্তু ভেবে উঠতেই পারে না কমলেশ, কি কথা বলা উচিত। সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে যেখানে, সেখানে এসে দাঁড়ালে এই রকম অপ্রস্তুত হতেই হয়।

নিজের মনের সঙ্গে কোনদিন ভণ্ডামি করেনি কমলেশ, আজও করে না। বুঝতে পেরে মনে মনে লজ্জাও পায়। শুধু মাধবের কথার চাপে পড়ে নয়, নিজেরই চোখের একটা দুঃসহ তৃষ্ণার কথায় কমলেশকে আবার বার্চহিল রোডের এই বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। নতুন অশথ পাতার রং সেই শাড়ি, আবু পাহাড়ে প্রথম দেখা সেই সুন্দর আলেয়াকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে, যে আলেয়ার জন্য কমলেশের মনে কোন মায়া ছিল না, রাগও ছিল না।

বাড়ির বাইরের বারান্দায় কাউকে দেখা যায় না। ড্রইং-রুমেও কেউ নেই। এক পাল বাচ্চা-কাচ্চা ছেলের কলরবের উচ্ছ্বাস আর দাপাদাপি বেশ মিষ্টি একটা হুল্লোড় মাতিয়ে ভিতরের একটা ঘরের বাতাস কাঁপাচ্ছে। কিন্তু জয়ন্তী কোথায়?

ভিতরের ঘরের ভিতরটাকেও বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলির সঙ্গে ছুটোপুটি করছে এক নারী, যাকে এই বাড়িতে কোনদিন দেখতে পায়নি কমলেশ।

কালো পাড়ের একটা সাদা শাড়ির আঁচল দিয়ে শক্ত করে কোমর বেঁধেছে এই নারী। একটা বড় বাচ্চাকে পিঠে, একটা ছোট বাচ্চাকে কাঁধে এবং সবচেয়ে ছোটটাকে বুকে সাপটে ধরে কি একটা মজার খেলা খেলছে। বাচ্চাগুলি কলকল করে চেঁচায়—রাক্ষুসী, রাক্ষুসী।

বাচ্চাগুলির আমোদ হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে। পিঠের উপর চড়ে বসে আছে যেটা, সেটা রাক্ষুসীর ঘাড়ে দুম দুম করে কিল বসায়। আর, কাঁধের বাচ্চা দুটো দু'হাত চালিয়ে রাক্ষুসীর চুল লণ্ডভণ্ড করে। বুকের কাছে যেটা, সেটার ফোলা গালটাকে রাক্ষুসীর মুখ যেন চুমো খাবার ছলে কামড়ে ধরে রয়েছে। ভয়ানক লাথি চালাতে পারে সব চেয়ে ঐ ছোটটা।

দুলে দুলে হাঁটতে থাকে রাক্ষুসী। ভিতরের ঘরের দরজা পার হয়ে, ড্রইং-রুমের ভিতরে ঢোকে। রাক্ষুসীকে আর দেখতে পায় না কমলেশ। ড্রইং-রুমের দরজায় পর্দা আছে।

দুলে উঠলো পর্দাটা; আর রাক্ষুসী একেবারে কমলেশের চোখের সামনে এসে পড়ে। রাক্ষুসীর চোখ চমকে ওঠে। তার পরেই হেসে ফেলে।

আর, কমলেশের চোখ চমকে ওঠে, একেবারে অপলক হয়ে, অকল্প্য এক বিস্ময়ের রূপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পিঠের আর কাঁধের বাচ্চা দু'টোকে নামিয়ে দিয়ে, শুধু বুকেরটাকে আঁকড়ে ধরে রেখে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে জয়ন্তী। জয়ন্তীর কানের একটা দুল খুলে গিয়ে চুলের সঙ্গে ফাঁস লেগে জড়িয়ে রয়েছে। বাঁ গালে ছোটটার চোখের কাজলের

একটা ছোপ লেগে আছে। মাথা হাতড়ে চুল খুঁজতে খুঁজতে জয়ন্তী বলে—আপনি কখন এলেন? বসুন।

আপনি, হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলে ফেলেছে জয়ন্তী। আবু ডাক-বাংলোতে হঠাৎ গিয়ে জয়ন্তীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লে, জয়ন্তী ঠিক এইরকম আশ্চর্য হয়ে আর এইরকম সুরে কথা বলে ফেলতো, কে আপনি?

—আপনার শরীর ভাল আছে তো? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আর দু'চোখে একটা উদ্বেগের বেদনা নিয়ে কমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকে জয়ন্তী। কমলেশের পায়ে চটি, গায়ের পশমী গেঞ্জির উপর একটা আলোয়ান। গেঞ্জির বুকটাতে আবার একটা মস্ত বড় ময়লার ছোপ। একটা ভাল মানুষ হঠাৎ পাগল হয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে যেমন ভয়-ভয় করে, তেমনি একটা ভয়-ভয় সন্দেহ যেন জয়ন্তীর চোখের বেদনায় মেদুর হয়ে ওঠে।

কমলেশ হাসে—শরীর ভাল আছে। হঠাৎ কি মনে হলো, চলে এলাম। অনেকক্ষণ হলো এসেছি।

জয়ন্তীর চোখের সন্দেহ যেন আরও গভীর হয়ে ছলছল করতে থাকে—কিন্তু আপনি এভাবে এলেন কেন?

—কিভাবে? কমলেশের মনের ভিতরে যেন একটা গলা-ধাক্কা অপমানের ভয় চমকে উঠেছে। জয়ন্তীর প্রশ্নটা কি সত্যিই কমলেশকে এই মুহূর্তে সোজা চলে যেতে বলছে?

গায়ের আলোয়ান সামলাতে গিয়ে নিজের চেহারাটাকে যেন মনে পড়ে যায়, আর লজ্জিতভাবে হেসে ফেলে কমলেশ।—ও, বুঝতে পেরেছি। তুমি···আপনি আমার এই অদ্ভুত সাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

জয়ন্তী গম্ভীর হয়—হ্যাঁ।

কমলেশ হাসে—কিন্তু আপনিই বা কি কম অদ্ভুত সেজে রয়েছেন ?

জয়ন্তী—সত্যি কথা বলুন, কি হয়েছে ?

কমলেশ—এমন কিছুই নয়। রাত-জাগা শরীরটাকে একটু হাওয়া খাওয়াবার জন্য সকালবেলা বাড়ির কাছেই পথে বেড়াতে বের হয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ এদিকে চলে এলাম। মনেই পড়েনি যে……।

জয়ন্তী—রাত জাগেন কেন ?

কমলেশ—বাধ্য হয়ে। আয়া বুড়ির অসুখ করেছে। টিঁকবে না বোধহয়। সারা রাত ওয়াচ ক'রে ওষুধ-টষুধ দিতে হয়…এই ব্যাপার। কাকা আর কাকিমার যা শরীর, তাতে ওঁদের পক্ষে তো আর একাজ সম্ভব নয়।

আনমনা হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তী। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর কমলেশের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু শক্ত স্বরে বলে—বসুন, বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকুন।

—কেন ?

—চা আনছি। খানসামা পালিয়েছে, কাজেই…।

বলতে বলতে চলে গেল জয়ন্তী। বাচ্চাগুলিও আশ্চর্য হয়ে, যে-লোকটা হঠাৎ এসে ওদের খেলার মজা নষ্ট করে দিয়েছে, তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, জয়ন্তীর পিছু পিছু গুটগুট করে চলে যায়।

দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছে জয়ন্তী। জয়ন্তীকে যে অদ্ভুত এক উৎসবের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে আজ। কোন নিখুঁত রূপকথার জগতেও বোধহয় এমন উৎসব নেই। চা আনতে চলে গিয়েছে জয়ন্তী। কমলেশের মনে হয়, চোখের উপর থেকে যেন কাঞ্চন-জঙ্ঘার সোনালী চূড়ার আভার চেয়েও সুন্দর একটা মায়াময়

লোভানি সরে গিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছে। ছিঁড়ে গিয়েছে রূপকথার জগৎটা, সেই সঙ্গে যেন একটা অভিশপ্ত অন্ধতার জগৎও ছিঁড়ে গিয়েছে। নইলে এরকম একটি জয়ন্তীকে আজ চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে কেন?

গালে কাজলের ছোপ লেগে থাকলে একটা মানুষকে এত সুন্দর দেখায়? কমলেশের অনেক দেখার আনন্দে অভিজ্ঞ চোখ দুটো আজ এতদিন পরে যেন জীবনের সবচেয়ে বড় লোভের ছবি দেখতে পেয়েছে। আজ বোধহয় বুঝতে পেরেছে কমলেশ, এই মেয়েরই নাম জয়ন্তী।

চা আনতে সত্যিই অনেক দেরী করছে জয়ন্তী। চা-এর পিপাসা নয়, কমলেশের জীবনের পিপাসাই যেন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইছে। এই মেয়েকে এই মুহূর্তে বুকে তুলে নিয়ে মীরাট চলে যেতে ইচ্ছা করছে।

কেন ভাল লাগছে? মনটা আজ আর বৃথা এই ফিলসফি করতে চাইছে না। ভাল লাগছে, সে ভাল লাগা যেন সব দেখা শোনা জানা ও চেনার একটা ওপার থেকে এসে দেখা দিয়েছে। কি আশ্চর্য, জয়ন্তীর বুকে একটা বিশ্রী ব্যথা আছে বলেই যে ওর সুন্দর শরীরটাকে আরও সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। একটা দাগ না থাকলে মানুষকে মানুষ বলে মনে হবে কেন? আর ভালই বা লাগবে কেন?

চা নিয়ে আসে জয়ন্তী। কমলেশ বলে—বাচ্চাগুলো গেল কোথায়?

জয়ন্তী—বাগানে খেলা করছে।

কমলেশ—ওরা কারা?

জয়ন্তী—ওরা হলো আমার ভক্তি পিসিমার চার ছেলে।

কমলেশ—তা'হলে আজকাল ওদের নিয়ে দিনগুলি বেশ খেলা করে কাটিয়ে দিচ্ছেন।

জয়ন্তী হাসে—তা কাটাতে হচ্ছে বৈকি। দিনরাত ওদের সামলাবার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। প্রত্যেকটাই হলো এক একটা সাংঘাতিক দুষ্টুমির রঘু ডাকাত।···কেউ খাবার সময় ঘুমিয়ে পড়বে, কেউ ঘুমোবার সময় খেতে চাইবে, আমাকে একটা মিনিটও জিরোতে দেয় না।

কমলেশ—ভক্তি পিসিমা কোথায়?

জয়ন্তী—কার্সিয়ং-এ। পিসিমার ঐ এক অভ্যেস, হঠাৎ এসে বাচ্চাগুলিকে আমার কাছে গছিয়ে দিয়ে সরে পড়েন; আর কার্সিয়ং-এ ফিরে গিয়ে মনের সুখে কয়েকটা দিন ঘুমিয়ে নেন।

কমলেশ হাসে—এদিকে আপনার ঘুম ছুটে যায়।

জয়ন্তী হাসে—তা এক-আধটুকু ছুটলোই বা।

গল্পের জের আর গড়াতে চায় না। কথা ফুরিয়ে যায়। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকেও বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। দু'জনেই যেন মনের একটা মুগ্ধতার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করতে চাইছে। কিন্তু হেরে যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ায় কমলেশ। জয়ন্তীও উঠে দাঁড়ায়। বিদায় নিতে চায় কমলেশ, জয়ন্তীও বিদায় দিতে চায়। কথা বলার দরকার হয় না। আসি বলবার দাবি নেই, যেও না বলবারও দাবি নেই।

কমলেশ বলে—আমি জানি, আমাকে চলে যেতে বলছেন আপনি; আমিও চলে যেতেই চাই।

শিলিগুড়ি স্টেশনের আলোর ভিড়ের মধ্যে ঢোকবার আগে ট্রেনটাকে খুব হঠাৎ মৃদু হয়ে যেতে হলো বলেই বোধহয় একটা ঝাঁকুনির আবেগে দুলে উঠলো। তাই কমলেশের ঘুমের ভারে

ঝুঁকে পড়া মাথাটাও দুলে উঠেছে। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। সেই সঙ্গে এমন অদ্ভুত একটা মিথ্যের মায়া মাখানো স্বপ্নটাও ভেঙ্গে গিয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। জয়ন্তী নামে একটা ঘৃণ্য ছলনার রকম দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে যে কমলেশ, তারই স্বপ্ন জয়ন্তীর সঙ্গে কত শান্ত আর স্নিগ্ধ ভাষায় কত কথা বলে নিল। ফিলসফার মেয়ে নয়; রূপকথার মেয়ে নয়; নিতান্ত এক আটপৌরে জীবনের মেয়েকে দেখতে পেয়েছে এই লোভী স্বপ্নটা। আরও আশ্চর্য, স্বপ্নটা একবারও শিকারী প্রিন্সের কথা তুলে জয়ন্তীর জীবনের গোপন ক্ষতের জঘন্যতার বিরুদ্ধে একটুও রাগ দেখাতে পারলো না।

হেসে ফেলতে ইচ্ছে করে। স্বপ্নটা যেন জয়ন্তী আর কমলেশের ঘৃণাভরা দ্বন্দ্বের যত তর্ক অভিযোগ আর শাস্তি ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু স্বপ্নের পক্ষে যেটা এত সহজে সম্ভব, বাস্তব জীবনের পক্ষে সেটা একটুও সহজ নয়। এমন স্বপ্ন কমলেশের উপর একটা হিংস্র বিদ্রূপ মাত্র।

দার্জিলিং ছেড়ে চলে আসতে পেরেছে কমলেশ। একটা শাস্তির কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে এইবার জীবনের খোলা পথের আলোছায়ার মধ্যে এসে দাঁড়াতে পেরেছে। জয়ন্তীর দার্জিলিং, তার উপর আবার চিন্তনীয়া নামে এক পুরনো বিভীষিকা সেখানে এসে ঠাঁই নিয়েছে। কমলেশের মত মানুষের পক্ষে ভয় পাওয়া আর পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

ভাবতে শুধু একটু খারাপ লাগে, লেপচা বুড়ি এখনও ভুগছে। তবু ডাক্তারের কথাটা স্মরণ করে খুশি হতে চেষ্টা করে কমলেশ, না, মনে হচ্ছে বুড়ি এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে।

ওই তো কাটিহার যাবার ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটা

বোধহয় আর বেশি দেরি করবে না। দৌড় দেবার জন্যে তৈরী হয়ে হিস্‌হিস্‌ করছে ট্রেনের ইঞ্জিন।

কুলি ডাকে কমলেশ। ব্যস্তভাবে কাটিহারের ওই ট্রেনের দিকে এগিয়ে যায়। আপতত কাটিহার। তারপর কয়েকটা দিন লখনউ। তারপর মীরাটে কারখানার অফিসে একটা টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলেই হবে, সাত দিনের মধ্যে কাজে জয়েন করবো।

[এগার]

ওটা কার গাড়ি? আজ সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে বার তিন চার বার্চহিল রোডের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল যে গাড়িটা, সেটা মাধব মিত্রের গাড়ি। জয়ন্তীর পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধে নেই। মাধব মিত্রের গাড়ির হর্নের শব্দ জয়ন্তীর কানের কাছে নতুন কোন শব্দ নয়।

এই তো, পর পর তিন বছর হলো, ওই মাধব মিত্র কলকাতা থেকে এসে বছরের অন্তত তিনটে মাস এই দার্জিলিংয়ে থাকেন। কার্ট রোডের ধারে মাধব মিত্রের বাড়িটার শৌখীন চেহারাটা দার্জিলিংয়ের পথচারীর কাছেও খুব পরিচিত।

আজ শুধু জয়ন্তীদের এই বাড়ির গেটের সম্মুখের পথ ছুঁয়ে মাধব মিত্রের গাড়িটা যেন অন্য কোন ব্যস্ততার আবেগে ছুটে চলে যায়। কিন্তু এমন দিন ছিল, যেদিন মাধব মিত্রের ওই গাড়ি জয়ন্তীদের বাড়ির এই ফটক পার হয়ে সোজা এই বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াতো।

জয়ন্তীর বাবা অতুলবাবুর সঙ্গে চায়ের শেয়ারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার দরকার হয়। কাজেই মাধব মিত্র প্রায়ই অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, এ ছাড়া আর কিছু জানতো না জয়ন্তী। অতুলবাবুও জানেন না যে, চায়ের কারবারের আলোচনা করা ছাড়া কলকাতার মাধব মিত্রের মনে আর কোন ইচ্ছা কিংবা কথা আছে।

কিন্তু জয়ন্তীর পক্ষে ঘটনাটাকে চিনে নিতে খুব বেশি দেরি হয়নি। মাধব মিত্রের এই আসা-যাওয়া একটা অন্য ইচ্ছার

ব্যস্ততা। জয়ন্তীকেই দেখতে আসে মাধব। জয়ন্তীর সঙ্গেই কথা বলতে চায়। জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুব খুশি হয়। জয়ন্তীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকতেও চায় মাধব।

অতুলবাবু একদিন তাঁর মেয়েকে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মাধব যে রোজই একবার এখানে আসে, এটা কি তুই পছন্দ করিস?

জয়ন্তীও একেবারে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিয়েছিল,—একটুও না।

অতুলবাবু নিজেই একদিন মাধব মিত্রকে বলে দিলেন—দরকার থাকলে তুমি বরং আমার অফিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। বাড়িতে যখন থাকি, তখন একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই। বাড়িতে বসে কারবারের কথা আলোচনা করতে ইচ্ছে হয় না।

মাধব মিত্র অতুলবাবুর এই স্পষ্টভাষিত অনুরোধের মর্ম বুঝতে পেরেছিল কিনা, তা সে-ই জানে। কিন্তু জয়ন্তীদের বাড়িতে আসবার ইচ্ছাটা, মাধব মিত্রের উৎসাহটা যেন আরও মত্ত হয়ে ওঠে। অতুলবাবু যে-সময়ে বাড়িতে থাকেন না, ঠিক সেই সময়েই জয়ন্তীদের এই বাড়ির বারান্দার উপরে উঠে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে থাকে মাধব মিত্র। মাঝে মাঝে ঘরের দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে কথা বলে—আমি এসেছি। কই? আপনি কোথায়?

জয়ন্তী বের হয়ে আসে। হাসতে চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে যায়। —আমি আমার পড়া নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি। আপনি বসুন; চা খেয়ে নিয়ে তারপর যাবেন।

মাধব—বেশ তো, চা নিয়ে আসুন তবে। মাধবের মুখের হাসি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

জয়ন্তী বলে—পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জয়ন্তী নয়, চাকর বীর বাহাদুর চা নিয়ে আসে। চা খায় মাধব। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওঠে—আজ আসি তবে।

কত রকমের কথাই না বললো কলকাতার মাধব মিত্র। গত বছরের কারবারের বিপুল প্রফিটের কথা। পুরীতে সমুদ্রের ধারে নতুন বাড়িটার কথা।—আমার ইচ্ছা, আপনি কিছুদিন আমার পুরীর বাড়িতে গিয়ে থাকুন আর সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে ফিরে আসুন।

জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে মাধব মিত্রের দুই চোখের তারা দুটো ছটফট করতে থাকে।

একদিন মাধব মিত্র তার ছোট বোন শিউলিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটাকে খুব শান্ত স্বভাবের বলে মনে হয়। বেশ লাজুকও। তা ছাড়া, চোখ দুটোও একেবারে ভীতু ছেলেমানুষের চোখ।

শিউলি বলে—আমি আসতে চাইনি। দাদার ধমক খেয়ে তবে এসেছি।

জয়ন্তী হাসে—কেন? এত ভয় কিসের!

শিউলি—আমার সব সময় ভয় করে।

জয়ন্তী—আমাকেও ভয় করছো নাকি?

শিউলি—হ্যাঁ।

জয়ন্তী—কেন?

—আপনি বড় গম্ভীর। আপনি ভয়ানক বিদ্বান।

হেসে ফেলে জয়ন্তী।—না, ভয় করো না।

গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক এসে ড্রইং-রুমের জানালার কাছে দাঁড়ায় আর উঁকি দেয়।

জয়ন্তীর দুই চোখ জলে ওঠে। আর জানালার কাছে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে জয়ন্তী।—তুমি যদি আবার এখানে আস, তবে আমি নিজের হাতে তোমাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেব।

ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলে শিউলি।

জয়ন্তী বলে—কিছু না। ওটা একটা খারাপ লোক। রোজ এসে ভয়ানক খারাপ কথা বলে, তাই ওকে সাবধান করে দিলাম।

শিউলির ভয় তবু দূর হতে চায় না। এইটুকু মেয়েকে কি বলে বোঝাবে জয়ন্তী; কেন ওই গেরুয়া-পরা লোকটাকে এমন কঠোর ভাষায় ধমক দিতে হয়েছে।

মাধব মিত্র শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছিল। শিউলির কথা থেকে কিছু বোঝা যায় না। তাই সেদিন নিজেই এসে জয়ন্তীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেই ফেলে মাধব।

—কী ব্যাপার; সাধুটাকে আপনি এরকম অপমান করলেন কেন?

জয়ন্তী—সাধু নয়।

মাধব—তার মানে?

হেসে ফেলে জয়ন্তী।—একদিন এক দেশী প্রিন্সের সঙ্গে সিঞ্চল ডাকবাংলোতে আমার দেখা হয়েছিল। সেই প্রিন্সের সঙ্গে এই ভয়ানক সাধুটিকেও দেখেছিলাম।

মাধব—কিছুই বুঝলাম না।

জয়ন্তী—তারপর থেকে প্রায়ই এই সাধুটা এখানে এসে আমাকে আশীর্বাদ করে, আমি শিগ্‌গির রাজরাণী হব।

—বুঝলাম! বুঝলাম! চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মাধব মিত্র।—এই দালালটাকে চাবুক না মেরে সেই বেটা প্রিন্সকে চাবুক মারলেই ভাল করবেন।

জয়ন্তী আর কথা বলে না। মাধব মিত্রের কাছে কথাটা বলে ফেলে জয়ন্তী যেন নিজেই লজ্জিত হয়েছে। ভুল হয়েছে। জীবনের কোন ঘটনার কথা মাধব মিত্রের কাছে বলবার দরকার ছিল না।

মাধব মিত্র সেদিন জয়ন্তীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে অদ্ভুত-ভাবে তাকিয়ে রইল। আর, আরও অদ্ভুত কয়েকটা কথাও বলে নিল।—আমি আজ নিশ্চিন্ত হলাম।

কে জানে, কী দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল মাধব মিত্র।

কিন্তু জয়ন্তীর চোখ জ্বলছে। মুখ ঘুরিয়ে কি যেন ভাবছে জয়ন্তী। বোধহয় চোখের সামনে অন্য একটা বিদ্রূপ দেখতে পেয়েছে।

কে এই মাধব মিত্র? মস্ত বড় কারবার আছে; আর অনেক টাকা আছে। এ ছাড়া মাধব মিত্রের আর কোন পরিচয় জানতে পারেনি জয়ন্তী। শুধু দেখতে পেয়েছে, এই মাধব মিত্র কোনদিন ভুলেও জয়ন্তীদের বাড়ির ড্রইংরুমের টেবিলে পড়ে থাকা বইগুলির দিকে একবার তাকায়ও নি। অর্কিডের ফুল ফুটেছে, সেদিকেও তাকায় না মাধব। কোনদিনও জিজ্ঞাসা করেনি যে, বারান্দার দেয়ালে এই যে সুন্দর একটা ছবি টাঙানো রয়েছে, এটা কি সত্যিই খাঁটি কাংড়া স্টাইলের পেন্টিং? টেনিস লনের দিকে তাকিয়ে কোনদিনও বলেনি মাধব—আপনি কি টেনিস খেলতে ভালবাসেন?

মাধব মিত্রও যেন নিতান্ত একটা দামী মোটর গাড়ির মুখর হর্ন। একটা মস্তিষ্কহীন ব্যস্ততা। রোজই আসে আর চলে যায়।

সে বছর, কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে এসেই যেদিন জয়ন্তীদের বাড়ির ফটকের কাছে হর্ণ বাজালো মাধবের গাড়ি,

সেদিন মাধব মিত্র নিজের চোখেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন, একটা লোক এক গাদা রঙীন পাখিকে শিকার করে মেরে নিয়ে এসেছে। মরা পাখিগুলিকে মালার মত করে দড়িতে ঝুলিয়েছে। লোকটা জয়ন্তীকে বলছে, খুব ভাল রোস্ট হবে মিস সাহেব; খুব সস্তা করে দিচ্ছি। কিনে ফেলুন।

দু'হাত তুলে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরে যেন ফুঁপিয়ে ওঠে জয়ন্তী। তার পরেই চেঁচিয়ে ওঠে।—শিগ্‌গির চলে যাও এখান থেকে।

মাধব মিত্র হাসে।—আপনি সত্যিই খুব নরম।

মাধবের কথার উত্তর না দিয়ে সরে যায় জয়ন্তী। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আর, মাধব মিত্রও ব্যস্তভাবে জয়ন্তীর পিছু পিছু হেঁটে সেই বারন্দার একটি চেয়ারের কাছে দাঁড়ায়। আর, আবার সেই কথা।—আপনি সত্যিই খুব……যেমন নরম মন, তেমনই নরম আপনার চেহারা। সেদিন কিন্তু…।

জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হয়ে ওঠে।—কি?

মাধব—সেদিন, যখন সেই সাধুটাকে ধমক দিচ্ছিলেন, তখন কিন্তু আপনাকে ভয়ানক শক্ত মনে হয়েছিল।

জয়ন্তী বলে—বাবা এখন অফিসে আছেন।

মাধব—জানি। সেই জন্যেই তো এখন এলাম।

জয়ন্তী—কি বললেন?

মাধব—আপনি তো বুঝতেই পারছেন, কি বলছি।

হঠাৎ জয়ন্তীর একেবারে চোখের কাছে এসে দাঁড়ায় মাধব মিত্র।—আমি জানি, আপনি আশা করে আছেন। আমিও, বলছি ঠিকই।

জয়ন্তী—কি?

—আমাদের বিয়ে হবে। আমার কোন আপত্তি নেই।

জয়ন্তীর ঠোঁট কাঁপতে থাকে।—আপনি খুব ভুল ধারণা করেছেন।

—তার মানে?

—তার মানে, বিয়ে হবে না। হতে পারে না।

—সত্যি কথা বলছেন?

—খাঁটি সত্যি কথা।

—আচ্ছা।

বারান্দা থেকে নেমে যায় মাধব মিত্র।

সেই দিন থেকে, আজ এক বছরেরও বেশি হলো, মাধব মিত্রের গাড়ি আর কোনদিন ফটক পার হয়ে এই বাড়ির বারান্দার কাছে আসে নি।

আর এখানে আসেনি মাধব মিত্র; কিন্তু সামনের ওই সড়ক দিয়ে সারাদিনের মধ্যে কতবারই না ছুটোছুটি করেছে মাধব মিত্রের গাড়ি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে জয়ন্তীর; মাধব মিত্রের গাড়িটা যেন একটা আক্রোশ নিয়ে ছুটছে। মাধব মিত্রের ইচ্ছার আত্মাটা প্রত্যাখ্যানের আঘাত সহ্য করতে না পেরে যেন একটা প্রতিশোধের তৃপ্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একটুও লজ্জিত হয় নি জয়ন্তী। কি আশ্চর্য, যে-কোন একটা মানুষ এসে জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেই একটা দাবি করবার অধিকার পেয়ে গেল, এমন ধারণা যে ভয়ানক একটা অন্যায়; এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও কি ওদের নেই? সেই দেশী প্রিন্সটা তো একটা সভ্য সংস্কারের মানুষই নয়; একটা লোভের প্রাণী মাত্র। তার ওপর কী কুৎসিৎ দুঃসাহস! জয়ন্তীর মত এক ভদ্র পরিবারের শিক্ষিতা মেয়ের কাছে কদর্য ইচ্ছার দূত পাঠাতেও সাহস করে। ওই মাধব মিত্রের তো বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, শুধু

নিজেরই ইচ্ছেটাকে দাবি করবার অধিকার বলে মনে করা সভ্য মানুষের চরিত্রের রীতি নয়।

কিন্তু ধারণা করতে পারেনি জয়ন্তী, ওই মাধব মিত্রের প্রাণটা কী ভয়ানক মিথ্যাচারী হতে পারে। কিন্তু ধারণা করবার সুযোগ পেতে বেশি দেরি হয়নি। একদিন মল্লিক সাহেবের স্ত্রী হেনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েই চমকে উঠে, বারান্দার উপরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, ঘরের ভিতরে হেনা ও মিস্টার মল্লিকের কথাবার্তার প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেয়েছিল জয়ন্তী।

মিস্টার মল্লিক হেনাকে বলছেন—তোমার বন্ধু জয়ন্তী যে এরকম এক-একটা গোপন কীর্তির হিরোইন, সেটা আগে কোনদিন ভুলেও ধারণা করতে পারি নি।

হেনা—কি ব্যাপার ?

মিস্টার মল্লিক—কী না করেছে তোমার বন্ধু জয়ন্তী। সিঞ্চল ডাক বাংলাতে এক দেশী প্রিন্সের সঙ্গে সারাটা রাত কাটিয়ে দিয়ে....।

আর শুনতে পায়নি জয়ন্তী ; কারণ, ওই ভয়ানক জঘন্য মিথ্যার শব্দ শোনবার জন্য আর দাঁড়িয়ে থাকতে চায়ওনি জয়ন্তী। সেই মুহূর্তে মল্লিক সাহেবের বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরে এসেছিল জয়ন্তী।

জয়ন্তীর জীবনের নামে এই বীভৎসতার কাহিনী যে কলকাতাতে পৌঁছে গিয়েছে, তা'ও একদিন জানতে পেল জয়ন্তী। জেঠতুতো দাদার স্ত্রী, অপর্ণা বউদি কলকাতা থেকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করলেন—এসব কী বিশ্রী নানা রকমের কথা কানে আসছে জয়ন্তী ? যদিও এক বর্ণও বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে আশ্চর্য লাগছে ; কেন তোমার নামে এরকমের জঘন্য গল্প রটেছে। প্রীতির মা বললেন, কোন্ এক ডাক বাংলাতে নাকি কী-একটা

কাণ্ড হয়েছে। একজন সন্ন্যাসী মানুষকে তুমি নাকি চাবুক মেরেছো? তা ছাড়া, তোমার বুকে নাকি খুব খারাপ একটা রোগও দেখা দিয়েছে?

রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে জয়ন্তী। ধন্য এই অপবাদের চোখ আর কান! জয়ন্তীর বুকের ব্যথাটার নামেও একটা ঘৃণা প্রচার করে ছেড়েছে। মাধব মিত্রকে তো কোনদিনও এই ব্যথার কথাটা বলেনি জয়ন্তী। তবে শুনতে পেল কেমন করে? খুব সম্ভব বিধু ডাক্তারের কাছ থেকে শুনেছে।

হ্যাঁ, ব্যথাই বটে। বুকের ভিতরে একটা ব্যথা। একদিন মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠেছিল জয়ন্তী। বুকের ভিতরে একটা বদ্ধ বাতাস যেন শক্ত লোহার তাল হয়ে পাঁজরের উপর আঘাত করেছে। কী ভয়ানক নিষ্ঠুর স্বপ্নটা! জয়ন্তী স্বপ্ন দেখেছিল, ভক্তি পিসিমার ছোট বাচ্চাটা জয়ন্তীর বুকের কাছ থেকে হঠাৎ আলগা হয়ে পড়ে গিয়েছে, আর, একটা স্রোতের জলে পড়ে ভেসে গিয়েছে।

বুকের পাঁজরে সেই যে একটা ব্যথা লাগলো, সেটা আর গেল না। বেশ কিছুদিন চাপা পড়ে থাকে; তারপরেই একদিন হঠাৎ তীব্র হয়ে জয়ন্তীর নিঃশ্বাসের বাতাস অদ্ভুত এক বেদনায় উতলা করে দেয়। কোন সন্দেহ নেই, এটা জয়ন্তীর জীবনের একটা স্বপ্নের গোপন ব্যাকুলতার ঘটনা। শিক্ষিতা ফিলসফার নারীর জীবনের ব্যাকুলতা নয়; একটি মেয়েলী মনের পিপাসার ঘটনা। কিন্তু মাধব মিত্রের মস্তিষ্কের বাহাদুরী আছে। এমন একটা মামুলু স্বপ্নের কথাটাকে একটা রহস্যময় কলঙ্কের কথা বলে রটনা করে দিতে পেরেছে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কাণ্ড হলো মীরাটের ইঞ্জিনিয়ার কমলেশের কাণ্ড। ভদ্রলোক কত সহজে এই মিথ্যা রটনার

কথাগুলিকে একেবারে বিজ্ঞানের সত্য বলে মনে করে বসলেন। একবারও ভাবলেন না যে, জয়ন্তীর মত মেয়ের জীবনে অমন কুৎসিত ঘটনা একটা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার। মানুষ সব দিকে শিক্ষিত হয়ে, সব রকম যুক্তি বুদ্ধি বিচার ও সতর্কতা দিয়েও একটা মিথ্যা রটনার কাছে কত সহজে অসহায় হয়ে যায়। মিথ্যাকে অবিশ্বাস করবার শক্তিটুকু যেন এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়।

ভালই হয়েছে। জয়ন্তীর জীবনের একটা প্রবল অভিমান যেন চিন্তার ভিতরে অদ্ভুত এক সান্ত্বনার গুঞ্জরণ ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়—ভালই হয়েছে। যে-মানুষ জয়ন্তীকে এত কাছে পেয়ে চিনতে বুঝতে ও জানতে পেরেও একটা জঘন্য মিথ্যুক কিংবদন্তীর কাছে নিজের বুদ্ধি-বিচার বিকিয়ে দেয়, আর জয়ন্তীকে ঘৃণা করতে পারে; তাকে এ জীবনে চোখের সামনে আর দেখতে না পাওয়াই একটা সৌভাগ্য। এমন মানুষের ভালবাসার মধ্যে যে কোন শক্তি নেই, থাকতে পারে না, সে সত্য বুঝতেও আর কোন অসুবিধে নেই।

তবু, এ কী উপদ্রব। মনের ভাবনাগুলির যে কোন রকম বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বার বার, প্রায় সর্বক্ষণ, যে-কোন কাজের মধ্যেও, ওই কমলেশের কথাই মনে পড়ছে।

অস্বীকার করবার তো উপায় নেই, ফিলসফির জয়ন্তী ফিলসফি দিয়ে নয়, বিদ্যে দিয়ে নয়, কালচারের যত অভিরুচি আর বিচিত্রতা দিয়ে নয়; শুধু এক সন্ধ্যার একটি নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় ব্যাকুল হয়ে উঠে এই কমলেশের হাতে হাত রেখে ফেলেছিল। জয়ন্তীর এই শরীরটারও সব সতর্কতা সেই মুহূর্তে যেন অলস হয়ে গিয়েছিল। কমলেশ নামে সেই মানুষটিকে ভাল লেগেছিল কেন, কারণ খুঁজে পায় না জয়ন্তী। কিন্তু কোন সন্দেহ তো নেই যে, ভাল লেগেছিল।

ভাল লাগে বইকি। এখন যে আরো ভাল লাগে। জলাপাহাড় রোডের সেই বাড়ির সেই ড্রইংরুমের সেই নিরিবিলি ঘন-অন্ধকারের সেই সঙ্কেত যে জয়ন্তীর মনের ভিতরে এখনও হঠাৎ এক-একটি মুহূর্তে উতলা হয়ে ওঠে। না, কোন কথা ছিল না, কোন অসুবিধা ছিল না, যদি চিন্তনীয়া এসে কমলেশের জীবনের ওই ভয়ানক কাহিনীটাকে এত স্পষ্ট করে বলে না ফেলতো। এখনও চিন্তনীয়া যদি হঠাৎ একবার ছুটে আসে আর বলে দেয়—না, ভুল, খুব ভুল, এগুলি নিতান্তই মিথ্যে অপবাদের রটনা, তবে এখনই জলাপাহাড় রোডে গিয়ে কমলেশকে বলতে পারবে জয়ন্তী—ক্ষমা করুন।

সত্যিই কি জলাপাহাড় রোডের বাড়িতে এখনও আছে কমলেশ? না, মীরাটে চলে গিয়েছে?

বুঝতে পারেনি জয়ন্তী, কিন্তু মিররের দিকে চোখ পড়লো বলেই বুঝতে হলো, এত উদ্ধত ভঙ্গী ধরে, কড়াকথার এক নিদারুণ বিতৃষ্ণী হয়ে কমলেশকে সোজা চলে যেতে বলে দিতে পেরেছে যে-মেয়ে, তারই চোখ দুটো অভিমানিনী গেঁয়ো মেয়ের চোখের মত করুণ হয়ে গিয়েছে।

[বারো]

অন্যদিন হলে এমন ঝলমলে রোদে ভরা দুপুরে ম্যালের পথে আর বেঞ্চিতে, আর ছোট-ছোট পার্কের এদিকে-ওদিকে মানুষের ভিড় বেশ একটু বেশি হয়ে দেখা দিত। কিন্তু কে জানে কেন, আজ এখানে মানুষের আনাগোনা বেশ একটু কম বলেই মনে হয়। পার্কের ঘাসের উপর রোদের মধ্যে গাছের ছায়াও অলস হয়ে লুটিয়ে রয়েছে। ওখানে এক সাহেব আর এক মেম ক্যামেরা হাতে নিয়ে বেঞ্চির উপর শুধু চুপ করে বসে আছেন। টাট্টুওয়ালা ছোকরা ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে-হাঁটা পথিকের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে; হাঁক-ডাক করে না।

মাধব মিত্রের গাড়িটাও যেন ম্যালের অলস রোদের ছোঁয়া লেগে অলস হয়ে গিয়েছে। জোরে স্টার্ট নিয়ে ছুটতে চায় না মাধবের গাড়ি। হঠাৎ মন্থর হয়ে গিয়েছে; দূরের একটা বেঞ্চির দিকে হঠাৎ চোখ পড়েছে মাধব মিত্রের; আর, যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখতেও পেয়েছে।

না, কোন অদ্ভুত আবির্ভাব নয়। চিন্তনীয়া একটা ছবির ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে বেঞ্চির উপর বসে আছে। চিন্তনীয়ার পাশে রাখা আছে একটি পশমী ওভারকোট, তার উপর চকোলেটের একটা প্যাকেট।

কিন্তু সিমলার মেয়ে চিন্তনীয়ার লালচে ঠোঁটের আভা যেন দার্জিলিং-এর এই রোদের ছোঁয়া লেগে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। দুই ঠোঁটের কোমলতার উপর যেন একটা নিবিড় তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখের তারা দুটো খুবই চঞ্চল। ম্যাগাজিনের

ছবির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই দূরের আকাশে আঁকা কোন শিখরের সাদা তুষারের সোনালী চমকের দিকে তাকিয়ে থাকে চিন্তনীয়া। পরক্ষণে পার্কের গাছের কুঞ্জগুলির দিকে ; তারপর সড়কের এদিকে কিংবা ওদিকে।

দেখে মনে হবে, কারও অপেক্ষায় এখানে বসে আছে চিন্তনীয়া। কিন্তু তা নয়। এই দার্জিলিংয়ে চিন্তনীয়ার পরিচিত এমন অন্তরঙ্গ কেউ নেই যে, এসময়ে এখানে চিন্তনীয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে। চেনা মুখের মধ্যে ওই তো এক জয়ন্তী। কিন্তু সে জয়ন্তী বাড়ির বাইরে খুব কমই বের হয়। তা ছাড়া, এখানে এসে চিন্তনীয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্য জয়ন্তীর মনে কোন ইচ্ছাও থাকতে পারে না। জয়ন্তী জানবেই বা কেমন করে যে, আজ এখন এখানে একটি বেঞ্চির উপর সিমলার মেয়ে চিন্তনীয়া নতুন স্টাইলের সাজে একেবারে চমৎকার ও চার্মিং ও লাভ্‌লি হয়ে বসে আছে ?

কারও অপেক্ষায় নয়। চিন্তনীয়া শুধু এখানে বসে থাকার জন্যেই বসে আছে। চোখের সামনের পথ দিয়ে যারা হেঁটে চলে যাচ্ছে, তাদের কাউকে চেনে না চিন্তনীয়া। কল্পনা করবারও দরকার হয় না যে, দার্জিলিংয়ে চিন্তনীয়ার কোন পরিচিত মানুষ এই পথে এসময়ে দেখা দিতে পারে।

হ্যাঁ, চিন্তনীয়ার একজন পরিচিত মানুষ বেশ কিছুদিন এই দার্জিলিংয়ে ছিল ; কিন্তু এখন আর নেই। জলাপাহাড় রোডের একটি বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এই সেদিন জানতে পেরেছে চিন্তনীয়া, চলে গিয়েছে কমলেশ। কাকিমা বললেন, বোধহয় মীরাটেই চলে গেল কমলেশ।

শুনে খুশি হয়েছে চিন্তনীয়া, কাকিমা কয়েকটা বিস্ময়ের কথা বললেন। কে জানে, কমলেশের মনটা হঠাৎ মীরাট চলে যাবার

জন্য ছটফট করে উঠলো কেন? এখনও তো ছুটি ফুরোয় নি। ইচ্ছে থাকলে আরও কিছুদিন থাকতে পারতো। তা ছাড়া, এটাও তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার; না অতুলবাবু, না তাঁর মেয়ে, কেউ একদিন এসে খোঁজও নিয়ে গেল না, কমলেশ আছে কি নেই! অন্তত জয়ন্তীর একবার খোঁজ নিতে আসা উচিত ছিল।

কাকিমা'র আক্ষেপের কথা শুনে চিন্তনীয়ার মুখে সেই যে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসি তখনই ফুরিয়ে যায়নি। ওই যে লালচে হয়ে অদ্ভুত একটা হাসি চিন্তনীয়ার নরম ঠোঁটের উপর ভয়ানক এক খুশির জ্বালার মত কাঁপছে, ওটা নিশ্চয় সেই হাসি।

ভাবতে পারেনি চিন্তনীয়া, জীবনে এমন একটা ঘটনা দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে। মীরাটের ইঞ্জিনিয়ার কমলেশ একটা ঘৃণার জীবের মত ব্যর্থ হয়ে ভালবাসার দার্জিলিং থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

লোকটা, মীরাটের এই কমলেশ, নিজেকে কেন যে একটা ইন্দ্র-চন্দ্র বলে ধারণা করে বসলো, তা সে-ই জানে। কিন্তু চিন্তনীয়ার মত মেয়ের ইচ্ছাটাকে যেন ভয়ানক এক অহংকারের জেদ নিয়ে তুচ্ছ করেছিল এই কমলেশ। তপোবনের মানুষ নয়; নারীর মুখের দিকে তাকাতে বেশ আগ্রহ আছে; আর চিন্তনীয়ার মুখটাকে তো অন্তত ত্রিশবার একেবারে চোখের কাছে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। কেউ ছিল না সেখানে, উঁকি দিয়ে দেখার মত কেউ ছিল না সেই ঘরের নিভৃতে, কিংবা সিমলার সড়কের সেই নির্জনতায়। তবু চিন্তনীয়াকে একটা কথাও স্পষ্ট করে বলতে পারেনি কমলেশ; অথচ চিন্তনীয়া কত স্পষ্ট করেই না অনেক কথা বলে দিতে পেরেছিল।

সেদিন মীরাটের কমলেশ ছিল রুড়কির ছাত্র-ইঞ্জিনিয়ার; ফাইন্যাল পরীক্ষা আসতে তখনো আট মাস বাকি। আর, কমলেশের বাবা পরিতোষবাবুর কারবারের অবস্থাও তখন খুব খারাপ। বাধ্য হয়ে নন্দবাবুকে তখন পার্টনার করেছেন পরিতোষবাবু। শেষে অনিদ্রা রোগে কষ্ট অসহ হওয়াতে ছোটভাই মনোতোষের নামে কারবারের স্বত্ব [illegible] করে দিলেন। দেনায় ভরা কারবারের স্বত্ব ছেলে কমলেশের উপর চাপিয়ে দিতে চাননি পরিতোষবাবু। পরিতোষবাবুও কি সেদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে একদিন এই কারবার বছরে তেত্রিশ হাজার টাকার নীট প্রফিট তুলে আনবে?

কী সুন্দর সিমলা। এপ্রিলের সিমলার পাহাড়ী আনন্দও যেন মাঝে মাঝে বাংলা দেশের বসন্তের মত নতুন পাতার সঙ্গে ঝিরঝির করে দুলছে, কাঁপছে ও কথা বলছে। রিজ থেকে সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে নেমে গিয়ে রেসকোর্সের কাছে এসে দাঁড়ায় চিন্তনীয়া আর কমলেশ। খুব কাছে, নীচের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, গ্রেনের ঘাসের সবুজ একেবারে স্রোতের জলের কিনারা পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়েছে। ফুটেছে রোডোডেনড্রন। তার চেয়ে বেশি রঙীন হয়ে চিন্তনীয়ার মুখে যেন অদ্ভুত একটা ইচ্ছার উৎসব ফুটে উঠতে চাইছে।

চিন্তনীয়া বলেছিল—দুঃখ করছো কেন কমলেশ?

কমলেশ—দুঃখ করছি না, বেশ আশ্চর্য হচ্ছি।

—কেন?

—বিয়ে হবে না, একথা বলছো কেন?

—অনেক বাধা আছে; অনেক অসুবিধে আছে। বাবার আপত্তি, বড়কাকার আপত্তি। মাসিমা, কাকিমা সবারই আপত্তি।

—তোমারও আপত্তি?

—বাধ্য হয়ে আমারও আপত্তি। কি করবো বল? সকলের আপত্তি তুচ্ছ করবার মত সাহস যে পাচ্ছি না।

কমলেশ হাসে—তাহলে আমারও বলবার কিছু নেই।

চিন্তনীয়া—কিন্তু ভালবাসা কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

—কি বললে?

—বিয়ে হবে না বলে কি আমাদের ভালবাসাও মিথ্যে হয়ে যাবে?

—মিথ্যে হয়ে যাবে কেন? কিন্তু…।

—কি?

—কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যেতে পারে, নিশ্চয়?

—হয়তো হবে।

—তবে?

—তবে আবার কি? ততদিন… যখনই তুমি ডাকবে, তোমার ইচ্ছে হলেই আমি তোমার কাছে যাব, আমি একটুও আপত্তি করবো না।

চিন্তনীয়ার কথাগুলি যেন পিপাসিত অগ্নিশিখার ভাষা। কমলেশের একটা হাত কত শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে চিন্তনীয়া।

কমলেশ বলে—একটু সরে দাঁড়াও, কারা যেন আসছে।

চিন্তনীয়ার সেই ভয়ানক গা-ঘেঁষা সান্নিধ্যের স্পর্শ থেকে হঠাৎ একটু সরে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কমলেশ। কমলেশের সারা মুখ জুড়ে যেন একটা অপমানের যন্ত্রণা শিউরে উঠেছে। নিতান্ত সাধারণ অবস্থার এক ছাত্র-ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করবার সাহস নেই চিন্তনীয়ার, কিন্তু একটি ভয়ানক দুঃসাহস আছে। কমলেশকে শুধু একটা পুরুষ যৌবনের প্রাণী বলে মেনে নিতে আর সমাদর করতে আপত্তি নেই এই নারীর; যার নাম চিন্তনীয়া।

সেই যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল কমলেশ, তারপর আর কোন মুহূর্তে চিন্তনীয়ার মুখের দিকে কোন আগ্রহ নিয়ে তাকাতে পারে নি। আর সেই যে, সিমলা ছেড়ে দিয়ে মীরাটে ফিরে এল কমলেশ, আর কোন দিন সিমলাতে যায়নি। চিন্তনীয়া অবশ্য বছরের প্রত্যেক ডিসেম্বরে আর জানুয়ারীতে মীরাটে এসেছে। বড়কাকার বাড়ির বাইরের ঘরে বসে কমলেশকে চিঠি লিখেছে। চিন্তনীয়ার চিঠি যেন মরিয়া হয়ে বার বার কমলেশকে ডেকেছে—একবার এস। তোমার মত মানুষকে আমার মত মেয়ে ডাকছে, এই সৌভাগ্য, এই সুযোগ তুচ্ছ করতে নেই।

কিন্তু কমলেশের প্রাণের কাছে এই চিঠির আহ্বানকে একটা দুঃসহ শ্লেষের আঘাত বলে বোধ হয়েছে। চিন্তনীয়ার সঙ্গে দেখা করেনি কমলেশ।

এই মীরাটেই একদিন যখন কানপুরের ব্যাঙ্কার নন্দবাবুর সঙ্গে চিন্তনীয়ার বিয়ে হয়ে গেল, তখন ঘরের টেবিলের উপর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিটার দিকে শুধু একবার তাকিয়েছিল কমলেশ। কিন্তু সে বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে পারেনি। কাজেই চিন্তনীয়াকেও আর দেখতে হয়নি।

সেই চিন্তনীয়া এখন কত খুশি হয়ে দার্জিলিংয়ের ম্যালের এক নিভৃতে একটি ছোট বেঞ্চির উপর ঝলমলে রোদের সঙ্গে দীপ্ত হয়ে বসে আছে।

বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে বেশ একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল চিন্তনীয়া; তাই দেখতে পায়নি, অপরিচিত এক ভদ্রলোক কখন্ চিন্তনীয়ার এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

—নমস্কার! চিন্তনীয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে হাত তোলে মাধব মিত্র।

—নমস্কার! হাত তুলে পাল্টা অভিবাদন জানায় চিন্তনীয়া।

মাধব মিত্র হাসে—আপনাকে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু এখনও জানি না, কে আপনি?

চিন্তনীয়া—আমিও আপনাকে কয়েকবার দেখেছি।

—দেখবেন বইকি। দার্জিলিংয়ে আমার বাড়ি আছে। বছরে অন্তত তিনটে মাস এখানেই থাকি। মাত্র দুটো গাড়ীকে এখানে রেখেছি। তার চেয়ে বেশি দরকারও হয় না।

—আপনি বোধহয় কলকাতার···।

—হ্যাঁ। মার্চেণ্ট! কলকাতার একটি গরীব দেশী মার্চেণ্ট। এই দার্জিলিং পর্যন্তই দৌড়। এখনও লণ্ডনে কোন বাড়ি কিনতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, পুরীতে একটা, শিলংয়ে একটা আর হাজারিবাগে একটা বাড়ি অবিশ্যি আছে। আপনি বোধহয়···।

—আমি এখন মীরাটের মানুষ। আগে ছিলাম সিমলার মেয়ে। ছবির ম্যাগাজিন একপাশে সরিয়ে রেখে দিয়ে হাসতে থাকে চিন্তনীয়া।

—আমি মাধব মিত্র।

—আমি চিন্তনীয়া মজুমদার।

—কিন্তু মিস্টার মজুমদারকে দেখছি না কেন?

—তিনি এসেছিলেন। কিন্তু একদিন থেকেই চলে গিয়েছেন। এখন বোধহয় মীরাট থেকে কানপুর আর কানপুর থেকে মীরাটে ছুটোছুটি করছেন।

—সার্ভিস বোধ হয়?

—না; উনি সার্ভিসকে ঘেন্না করেন।

—তাই বলুন। বিজনেস! শুনে সুখী হলাম। আমিও, সত্যি কথা বলছি মিসেস মজুমদার, চাকরি-বাকরিকে ভয়ানক ঘেন্না করি; সেটা যত বড় বিদ্বানের চাকরি-বাকরি হোক না কেন।

—উনিও ঠিক এই কথা বলেন।

—আপনি কি বলেন? প্রশ্ন করেই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মাধব মিত্র।

চিন্তনীয়া হেসে ফেলে—আমিও চাকরির মানুষকে একটুও পছন্দ করি না।

চিন্তনীয়ার বেঞ্চিতে রাখা ওভারকোটের পাশে বসে পড়ে মাধব মিত্র।—সত্যি, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড়ই সুখী হলাম।

চিন্তনীয়া—মিসেস মিত্রকে কোথায় রেখে এলেন?

মাধব—কোথাও না। তিনি কোথাও নেই। তিনি এখনও আসেন নি। আবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মাধব মিত্র।

চিন্তনীয়া—আপনি আর কতদিন দার্জিলিংয়ে থাকবেন বলে মনে করছেন?

মাধব মিত্র হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চিন্তনীয়ার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কোন কুণ্ঠা নেই, মাধব মিত্রের এই দৃষ্টিতে খুবই স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ও সপ্রতিভ একটা প্রশ্ন যেন জ্বলজ্বল করছে। তাই হঠাৎ মাধব মিত্র প্রশ্ন করে ওঠে।—আপনি আগে বলুন, আপনি কতদিন এখানে থাকবেন?

চিন্তনীয়া—ঠিক বলতে পারছি না।

মাধব—তবে আমারও কোন ঠিক নেই।

চিন্তনীয়া এইবার ছবির ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিয়ে পাতা ওলটাতে থাকে।—আপনি মিছিমিছি কেন আমার মত অজানা একজনের সঙ্গে এরকমের তর্ক বাধিয়ে তুলছেন।

মাধব মিত্রের গলার স্বর আরও গভীর হয়ে যায়।—মিছিমিছি নয়। ভাবছি, আমার একটা গাড়ি শুধু আপনারই দরকারে কাজের জন্য ছেড়ে দেব।

চিন্তনীয়া—না না, ওসব করবেন না।

মাধব—আপনার আপত্তি আমি গ্রাহ্যই করবো না ; আপনি যাই মনে করুন না কেন। আপাততঃ...।

চিন্তনীয়া—কি ?

মাধব—চলুন না কেন, কিছুদূর বেড়িয়ে আসি। ধরুন, লেবং কিংবা টাইগার হিলের দিকে মাইল দু'-এক....।

চিন্তনীয়া—আমাকে কিন্তু আপনি অপ্রস্তুত করছেন, খুবই লজ্জায় ফেলছেন।

মাধব—অপরাধ নেবেন না। কিন্তু আমার অনুরোধ, মিছে আপত্তি করবেন না। দার্জিলিংয়ে যখন এসেছেন, তখন দার্জিলিংকে একটু ভাল করেই দেখে নিন।

উঠে দাঁড়ায় চিন্তনীয়া। মাধব বলে—ওই যে, আমার গাড়ি।

গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গল্প করে মাধব ও চিন্তনীয়া।

মাধব বলে—কী আশ্চর্য, এক ঘণ্টাও হয়নি আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো ; অথচ মনে হচ্ছে, কতদিনের পরিচয়।

চিন্তনীয়া হাসে—বলতে লজ্জা পাচ্ছি, তবু বলতে পারি ?

মাধব—বলুন।

চিন্তনীয়া—কেন যে আপনার সঙ্গে একেবারে আপনজনের মত কথা বলে ফেললাম, বুঝতে পারছি না।

মাধব—পর মনে করলেই পর ; আপন মনে করলেই আপন।

[তের]

আজকের কথা নয়, অনেকদিন আগের কথা। নন্দবাবুর সঙ্গে চিন্তনীয়ার যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, তার পর বোধহয় মাস চারেক পরে একটি দিনে নন্দবাবুর সঙ্গে কমলেশের হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। দিল্লী মেলের একটি কামরাতে উঠেই দেখতে পেয়েছিল কমলেশ, নন্দবাবু বসে আছেন। নন্দবাবুও দিল্লী যাচ্ছেন।

হু'দিকের হুই সীটে মুখোমুখি বসে নন্দবাবু আর কমলেশ সেদিন খুব গল্প করেছিল। অনেক কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসিও করেছিল।

বেশ রাত হয়েছিল। ট্রেনটাও সামনের স্টেশন থেকে সিগ্-ন্যালের কোন সাড়া না পেয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনের হুদিকেই খোলা মাঠ জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে। মাঠের উপর এখানে-সেখানে গাছের কুঞ্জও আছে বোঝা যায়। মাঝরাতের মাঠের সেই নীরবতার মধ্যে শুধু একদল খুশী ময়ূর মুখর হয়ে ডেকেই চলেছে। ওদের দেখা যায় না, শুধু শোনা যায়।

নন্দবাবু নিজেই হঠাৎ হাসি থামিয়ে দিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার পরেই বললেন—আপনাকে একদিন যে চা খেতে বাড়িতে ডাকবো, তা'ও আজ পর্যন্ত হয়ে উঠলো না।

কমলেশ হাসে—একদিন হবে।

নন্দবাবু চিন্তান্বিতের মত মাথা নাড়েন।—সন্দেহ আছে। বোধহয় সম্ভব হবে না।

কমলেশ আশ্চর্য হয়—কেন?

নন্দবাবু—কি জানি কেন, চিন্তনীয়া আপনার উপর খুবই অপ্রসন্ন। বুঝতেও পারি না, আপনার সম্পর্কে চিন্তনীয়ার মনে কেন এত খারাপ ধারণা হলো ?

কমলেশ এবার গম্ভীর হয়। তবু হাসতে চেষ্টা করে।—আমি দুঃখিত। এ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।

নন্দবাবু লজ্জিতভাবে বলেন—আমি বিস্মিত। আপনাকে আমি যতটুকু জানি, তাতে আপনার সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা আমার থাকতেই পারে না। কিন্তু ভেবে পাই না, চিন্তনীয়া আপনার সম্পর্কে কেমন করে কী এমন ভয়ানক কথা শুনতে পেয়েছে যে, আপনার সম্পর্কে তার ধারণা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

কমলেশ হাসতে চেষ্টা করে।—আমিও ভেবে পাচ্ছি না।

কমলেশের পক্ষে সত্যিই কিছুই ভেবে পাওয়া সম্ভব নয়। নন্দবাবুর কাছে মিথ্যে কথা বলেনি কমলেশ। কমলেশ জানে, চিন্তনীয়ার মনে কমলেশের উপর রাগ করবার, এমন কি ঘৃণা করবারও একটা যুক্তি আছে। কিন্তু খারাপ ধারণা কিসের ? পৃথিবীতে আর কেউ না জানুক, অন্তত চিন্তনীয়া জানে যে, কমলেশ একদিন ভয়ানক প্রগল্‌ভ এক আহ্বানের দাবি মেনে নিতে পারেনি। সে দাবি মেনে নিলে শুধু নিজেকে নয়, চিন্তনীয়াকেও অপমান করা হতো।

দার্জিলিংয়ের অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তী সেদিন কমলেশের জীবনের যে গ্লানির ঘটনাগুলিকে একেবারে উদাত্ত স্বরে শুনিয়ে দিল, সেগুলিও একটা বিস্ময় বটে। কী আশ্চর্য, মানুষের জীবনে এমন অপবাদও সম্ভব হয় ? গুণ হৈয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায় ?

শুধু সেদিন জয়ন্তীর মুখে নয়, অনেকদিন আগেই পাটনাতে কালু মামার কাছে, তারপর একবার কলকাতাতে সুলেখা বউদির কাছে, আর-একবার দেওঘরের জীবনকাকার কাছে একটা বিস্ময়ের

অভিযোগ শুনতে হয়েছে, কী ব্যাপার কমল, চিন্তনীয়া কেন এসব কথা এত মুখর হয়ে বলে দিয়ে গেল ?

পাটনার কালুমামা, কলকাতার সুলেখা বউদি আর দেওঘরের জীবনকাকা, এঁরা সবাই একদিন ধারণা করেছিলেন, সিমলার মেয়ে চিন্তনীয়ার সঙ্গেই কমলেশের বিয়ে হবে বোধহয়। কিন্তু হলো না। কে জানে, কেন হলো না ? তবু এঁদের চিন্তায় এই প্রশ্ন নিয়ে কোন জল্পনা কল্পনা ও গবেষণা ছিল না।

কিন্তু চিন্তনীয়া বেড়াতে এসেছিল ; একবার দেওঘরে, আর দু'বার পাটনাতে। কলকাতাতে তো প্রতি বছরই একবার আসে। তাই এঁরা সবাই জানতে পেরে চমকে উঠেছিলেন, কেন চিন্তনীয়ার সঙ্গে কমলেশের বিয়ে হয় নি।

তাই এঁরা সবাই খুবই আশ্চর্য হয়ে, বেশ একটু দুঃখিত হয়ে আর নিতান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে কমলেশকে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিলেন—চিন্তনীয়া এসব কী অদ্ভুত কথা বলে গেল ? আমরা তো কোনদিন তোমার নামে এ-ধরনের কোন ব্যাপারের কথা শুনিনি।

মনে মনে হেসেই ফেলেছিল কমলেশ। ওধরনের কোন ব্যাপারই যখন হয়নি, তখন এঁরা শুনলেন কি করে ? এসব ব্যাপার, কমলেশের জীবনের এই সব কলঙ্ককর ঘটনাগুলি যে চিন্তনীয়া নামে এক নারীর কল্পলোকের চমৎকার সৃষ্টি।

ঠিক কথা, কমলেশের বন্ধু লোকনাথের স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল। মীরাটের পুলিশও ঠিক সন্দেহ করেছিল। কিন্তু হাসপাতালের রিপোর্টে শুধু বলা হয়েছিল, খাবারের সঙ্গে ধুতুরার বিষ মিশেছিল, তাই এই দুর্ঘটনা। পুলিশের সন্দেহ অভিযোগ হয়ে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েও তাই কিছু করতে পারেনি। প্রমাণের অভাবে মামলা মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল।

লোকনাথ কমলেশের বন্ধু ; খুব সত্যি কথা। লোকনাথের স্ত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, এটাও একটা সত্য ঘটনা ; লোকনাথের কাছে সে-কথা তার স্ত্রী নিজেই একদিন স্বীকার করেছিল। এই সবই সত্য। কিন্তু আরও একটা সত্য এই যে, লোকনাথের স্ত্রীকে কোনদিন চোখেও দেখেনি কমলেশ। তিন বছরের মধ্যে লোক-নাথের বাড়িতে মাত্র তিনবার গিয়েছিল কমলেশ ; কিন্তু এই তিন-বারই লোকনাথের স্ত্রী মীরাটের বাড়িতে ছিল না, কলকাতায় ছিল।

স্কুলের জীবনের সেই দুঃখের ঘটনাকে আজও স্পষ্ট মনে করতে পারে কমলেশ। ম্যাট্রিকুলেশনের ফাইন্যাল। অঙ্কের পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষার ঘরের মধ্যেই সীটের উপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল পনের বছর বয়সের কমলেশ। হেড মাস্টার ছুটে এসেছিলেন। আর নিজেই কমলেশকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ডাক্তার সরকারের ক্লিনিকে এসেছিলেন।

আরও-তিনটে বিষয়ের পরীক্ষা বাকি ছিল। সে পরীক্ষা দিতে পারেনি কমলেশ। ছাত্রজীবনের আরও একটা বছর পুরনো ক্লাসেই থেকে যেতে হলো। মনে আছে কমলেশের, হেড মাস্টারের সঙ্গে আবার দেখা হতে কেঁদে ফেলেছিল কমলেশ।

বিলেতে থাকতে কোন উৎসবের ভোজের টেবিলেও মদের গেলাস স্পর্শ করেনি কমলেশ। বন্ধুরা ঠাট্টা করেছে ; তুমি একটি পিছু-তারিখের মানুষ। হ্যাঁ, পেটে একটা ব্যথা আজও আছে। ডাক্তার সরকার বলেছেন, ক্ষিদে তুচ্ছ করবার ফল। ডাক্তারের সন্দেহ মিথ্যে নয়। বিলেত থেকে দেশে ফিরেই রাজস্থানের এমন একটা জায়গায় খনিজ পাথর গুঁড়ো করবার একটা কারখানার মেশিন বসাবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল কমলেশ, যেখানে ত্রিশ মাইল দূরের এক বাজার থেকে উটের পিঠে বাহিত হয়ে আটা আর

খুন আসে। মীরাটের চেনা-জানা সকলেই বলেছিলেন, যেও না কমলেশ, ও জায়গায় চাকরি করতে গিয়ে শেষে কি না খেয়েই প্রাণটা হারাবে ?

এমন কি নন্দবাবুও বলেছিলেন, যাবেন না। ওখানে পাঁচ টাকা খরচ করলেও এক সের দুধ পাবেন না। তবু গিয়েছিল কমলেশ। খুব মনে আছে, কাজের ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে যেত, সকাল থেকে এই ছয় ঘণ্টার মধ্যে পেটে এক টুকরো রুটিও পড়েনি।

যাই হোক্, চিন্তনীয়ার গবেষণা আর রটনা ধন্য। দেওঘরের জীবনকাকা দুঃখিত স্বরে বলেছিলেন, চিন্তনীয়া বললে যে, অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তোমার পেটের ভিতরে একটা ক্ষত হয়েছে। জীবনকাকাকে শুধু একটি কথা বলেছিল কমলেশ, চিন্তনীয়াই জানে, কেন সে একথা বললো।

মীরাটের কারখানার ভিতরে নিজের কেবিনে বসে কমলেশের মন হঠাৎ এক-একবার উতলা হয়ে এইসব কথাই ভাবে। মেশিনের গুঞ্জন আর হর্ষের শব্দ হঠাৎ যখন থেমে যায়, শুধু তখন চমকে ওঠে কমলেশ। তখন কিন্তু দার্জিলিংয়ের সেই নারীর সেই অদ্ভুত ভাষার ধিক্কারের শব্দটা বুকের ভিতরে যেন গুমরে ওঠে। কোন সন্দেহ নেই ; আর কেউ নয়, ওই চিন্তানীয়ার কাছেই এই মিথ্যা অপবাদের গল্পগুলি শুনতে পেয়েছে জয়ন্তী। কি আশ্চর্য, জয়ন্তীর মনে একবার এই প্রশ্ন দেখাও দিল না যে, চিন্তনীয়ার কথাগুলি সত্য না হতেও পারে। কত সহজে চিন্তনীয়ার মুখের নিদারুণ মিথ্যেটাকে বিশ্বাস করে বসে রইলো এক শিক্ষিতা যুক্তিবাদিনী ফিলসফার মেয়ে ?

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, একটা চিঠি লিখে জয়ন্তীকে জানিয়ে দিতে, চিন্তনীয়ার মুখের গল্পগুলি আষাঢ়ে গল্পের চেয়েও মিথ্যে।

তবু আপনার মত মানুষ সে মিথ্যে এত সহজে বিশ্বাস করে নিল কেন?

না, লিখে কোন লাভ হবে না। এভাবে জীবনের নিরীহতার কৈফিয়ৎ দেওয়াও একটা ভীরুতা। দার্জিলিংয়ের অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তী এমন কোন মহীয়সী নন যে, তাঁর কাছে চরিত্রের শুদ্ধতার প্রমাণ দিয়ে প্রশংসার সার্টিফিকেট পেতে হবে।

[চৌদ্দ]

শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। দার্জিলিংয়ের আকাশে কদাচিৎ কখনও রোদের আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তা ছাড়া সব সময়ই যেন একটা গম্ভীর বিষাদের সেঁতসেঁতে প্রলেপ দার্জিলিংয়ের আকাশকে ঢেকে রেখেছে।

সেদিনের পর অনেকদিন পার হয়ে গিয়েছে। তিন মাসেরও বেশি হবে। এরই মধ্যে ভক্তি মাসিমা কার্সিয়ং থেকে একবার এসেছেন আর বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছেন। আর, জয়ন্তীর এখন জানতেও বাকি নেই যে, কমলেশ এখানে নেই। মনতোষবাবুর বাড়ির আয়া, সেই লেপচা বুড়ি এসেছিল। বুড়ি নিজেই বললে, কমলেশ বাবা মেরাট চলা গিয়া। বলতে গিয়েই কেঁদে ফেলেছে লেপচা বুড়ি।

কিন্তু নিজেরই চোখে দেখতে পেয়ে বেশ আশ্চর্য হয়েছে জয়ন্তী, মাধব মিত্র এখনও দার্জিলিংয়ে আছে। মাধবের গাড়ি এই বার্চ হিল রোডের উপর দিয়ে প্রায় রোজই ছুটে চলে যায়। এক-একদিন দেখতে পেয়েছে জয়ন্তী, আর কেউ নয়, মাধব মিত্র নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে যেতে গিয়ে গেটের কাছে হর্ণ বাজায় না মাধব মিত্র। এবাড়ির গেটের দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও করে না মাধব মিত্র।

এটা জয়ন্তীর জীবনের একটা স্বস্তি। কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না, প্রতি বছর এই সময়ে যে ব্যস্ত মার্চেণ্ট ভদ্রলোকের কলকাতায় থাকবার কথা, সে এখনও দার্জিলিংয়ের কুয়াশার মধ্যে ছুটোছুটি করে কেন ?

আরও একটা আশ্চর্য ; চিন্তনীয়া এখনও দার্জিলিংয়ে আছে, অথচ আর একদিনও জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। জয়ন্তীর বাবা অতুলবাবুর কাছেই চিঠি লিখেছেন নন্দবাবু, চিন্তনীয়ার চিঠি পাচ্ছি না। চিন্তনীয়ার দিদি অসীমাদিও কোন চিঠি দিচ্ছে না। ওরা সবাই কেমন আছে, আপনি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবেন।

দার্জিলিংয়ে এসে চিন্তনীয়া যে অসীমাদির বাড়িতে আছে, একথা জয়ন্তীর জানাই ছিল। অসীমাদি চিরকুমারী মানুষ; পঞ্চাশের উপর বয়স, মেয়ে স্কুলের টিচার। অসীমাদি তাঁর একা-জীবনের গেরস্থালীর কাজ, রান্না-বান্না থেকে শুরু করে টবের গাছের পাতা ছাঁটা পর্যন্ত সবই নিজের হাতে করেন। তা ছাড়া স্কুলের কাজ আছে। এত কাজের পর যেটুকু সময় পান, সেটুকু সময়ও চুপ করে বসে থাকেন না। গীতা পড়েন অসীমাদি। চিন্তনীয়া শুধু এই একবার নয়, আরও কয়েকবার দার্জিলিংয়ে এসেছে। কিন্তু সেজন্য অসীমাদিকে কোন চিন্তায় পড়তে হয়নি। নিজেই টাকা খরচ করে আয়া আর বয় রেখেছে চিন্তনীয়া। চিন্তনীয়ার খাওয়া-দাওয়া আর সাজ-প্রসাধন, সবই অন্য রকমের। কিন্তু সেজন্য অসীমাদি একটুও বিচলিত নন। তিনি তাঁর গীতা নিয়ে আর টবের ফুলের সেবা নিয়ে পড়ে থাকেন। চিন্তনীয়া দিনে কতবার কফি খেয়েছে সেটা বোধহয় অসীমাদির চোখেও পড়ে না। কিংবা চোখে পড়ে থাকলেও ঘটনাটা অসীমাদিকে চিন্তান্বিত করে তোলবার মত ব্যাপারই নয়। চিন্তনীয়াকে কোন কথা বলতে অথবা আদেশ করতে হলে বড় জোর এটুকু বলতে পারেন—নন্দ একটা চিঠি লিখেছে চিনু, তুই চিঠিটা পড়ে নিয়ে একটা জবাব দিয়ে দিস।

অতুলবাবু খোঁজ নিয়ে এটা জানতে পেরেছেন বলেই জয়ন্তীও

জানতে পেরেছে। অতুলবাবু আক্ষেপ করেন—চিন্তনীয়া একটা চিঠি লেখবারও সময় পায় না, কী আশ্চর্য!

কিন্তু এবাড়িতে এসে একটিবার উঁকি দিয়ে যেতেও পারে না কেন চিন্তনীয়া? প্রশ্নটা জয়ন্তীর মনের একটা আক্ষেপ হয়ে মাঝে মাঝে ছটফট করে ওঠে। চিন্তনীয়া একবার এলে হয়। তাহলে সেই ভদ্রলোকের জীবনের আরও অনেক গল্প নিশ্চয় শুনতে পাওয়া যাবে। চিন্তনীয়া যদি নিজের থেকে কিছু না বলে, তবে জিজ্ঞাসা করেই জেনে নিতে পারা যাবে।

বুঝতে পেরে লজ্জাও পেয়েছে জয়ন্তী। ফিলসফি পড়তে আর একটুও ভাল লাগে না। বুকের ভিতরে যেন ছোট্ট একটা অভিমান ধুকপুক করছে। কোথা থেকে একটা অচেনা মানুষ এসে কদিনের মধ্যেই মনের মধ্যে একটা স্বপ্ন ধরিয়ে দিয়ে নিজেই আবার সেই স্বপ্নকে মিথ্যে করে দিল। শুধু কি মন? অস্বীকার করবার সাধ্যি নেই জয়ন্তীর, জলাপাহাড় রোডের বাড়ির সেই সন্ধ্যার ড্রয়িংরুমের নিরালায় নীরব অন্ধকারটা জয়ন্তীর এই সাবধানের শরীরটার সব আপত্তিকে একজনের স্পর্শের কাছে মিথ্যে করে দিয়েছিল। যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে হিসেব করেও কিছু বুঝতে পারা যায় না, কেন এমন ভুল হলো।

আরও অদ্ভুত, আজ সকাল থেকে বার বার শুধু মনে পড়ছে, জলাপাহাড় রোডের বাড়ির আয়াবুড়ি আর আসে না কেন। একবার যদি আসতো, তবে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারতো জয়ন্তী, মীরাটের কমলেশ দার্জিলিংয়ে আবার কবে আসবে। শিগগির আসবার কোন কথা আছে কিনা। বাড়ির লোকের মুখে এবিষয়ে কোন আলোচনার কথা আয়াবুড়ি শুনতে পেয়েছে কিনা।

অস্বীকার করবার উপায় নেই; জয়ন্তীর মনে আজ যেন একটা

নির্লজ্জ ইচ্ছা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, আর একবার দার্জিলিংয়ে আসুক কমলেশ। যদি কমলেশের সঙ্গে দেখাও না হয়, তবু জয়ন্তীর প্রাণটা বোধহয় একটা সান্ত্বনা পেতে পারবে। দার্জিলিংয়ে এলে কি জয়ন্তী নামে এক নারীর কথা স্মরণ না করে পারবেন সেই অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক!

না, আয়াবুড়ি নয়। বারান্দা থেকে চটপট করে হেঁটে ঘরের ভিতরে ঢুকে আর জয়ন্তীর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে উঠলো যে আগন্তুক, সে হলো চিন্তনীয়া।

বেশ একটু অদ্ভুত রকমের হাসি; চিন্তনীয়াকে এভাবে আসতে কোনদিন দেখেনি জয়ন্তী। যেন একটা ধাঁধাঁর হাসি। এই সকালে এরকম একটা মূর্তি নিয়ে কোথা থেকে বেড়িয়ে এল চিন্তনীয়া? চোখের দৃষ্টিটা ক্লান্ত; যেন ঘুমকাতুরে ছুটো চোখ জোর করে তাকিয়ে থাকতে চেষ্টা করছে। চিন্তনীয়ার গায়ের পশমী ওভারকোটও যেন সেঁতসেঁত করছে। চিন্তনীয়ার খোঁপাতে কয়েকটা চোরকাঁটা। চিন্তনীয়ার জুতোতে অনেক ধুলো; সেই ধুলোও একটু কাদা-কাদা হয়ে উঠেছে। বোধহয় ধুলোর সড়কে অনেকদূর বেড়িয়ে তারপর শিশির-ভেজা কোন মাঠের ঘাসের উপর অনেক হাঁটাহাঁটি করেছে চিন্তনীয়া।

চিন্তনীয়া হাসে।—আগে এক কাপ চা খাই। তারপর গল্প করবো।

কিন্তু চা আসবার আগেই গল্প শুরু করে দেয় চিন্তনীয়া। গল্পের ভাষাও মাঝে মাঝে চিন্তনীয়ার হাসির শব্দের মত কলকল করে ওঠে।—যাই বল জয়ন্তী; এইবার দার্জিলিংয়ে এসে এত অসুবিধের মধ্যেও বেশ ভাল আছি।

জয়ন্তী—নন্দবাবু লিখেছেন, তোমার চিঠি পাচ্ছেন না।

চিন্তনীয়া—ঠিকই; অসীমাদিকে কতবার মনে করিয়ে দিলাম,

ভদ্রলোককে একটা চিঠি লিখে দিন বড়দি ; কিন্তু সব কথা স্রেফ ভুলে গেলেন। সর্বক্ষণ গীতা নিয়ে পড়ে থাকলে কাজের কথা মনে করবেন কখন ?

জয়ন্তী—কিন্তু তুমি কেন…।

চিন্তনীয়া—আমি ভাই খুব ব্যস্ত আছি। এক মিনিটও সময় পাচ্ছি না। কাজেই ব্যস্ত হয়ে বড়দিকে অনুরোধ করেছিলাম।

চা আসে। চা খায় চিন্তনীয়া। কিন্তু জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি এবার যেন ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে। কী সাংঘাতিক তৃষ্ণার্তের মত চা খাচ্ছে চিন্তনীয়া। দেখতে একটুও ভাল লাগছে না। কিন্তু চিন্তনীয়ার মুখের ভাষা কলকল করে বেজে ওঠে।—বাস্তবিক, চমৎকার মানুষ। আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, পুরুষ মানুষের মন এত নরম আর এত উদার হতে পারে।

জয়ন্তী—কার কথা বলছো ?

চিন্তনীয়া—তুমি চিনবে না। অথচ ভদ্রলোক তোমাদের এই দার্জিলিংয়েই আছেন। প্রতি বছর এখানে আসেন আর কিছুদিন থাকেন। কলকাতার মার্চেন্ট মাধব মিত্র।

চমকে ওঠে জয়ন্তী।—তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের চেনা হয়েছে কবে ?

—এই তো কিছুদিন হলো। ভদ্রলোকের মনটা যেন শিশুর মন। কথাবার্তাও সেইরকম। বেশ টাকা পয়সার মানুষ, কিন্তু প্রায় সন্ন্যাসীর মত একটা জীবন। বিশেষ করে….।

কি-যেন বলতে গিয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটা সলজ্জ হাসির আবেগ ঢাকা দিল চিন্তনীয়া। কিন্তু জয়ন্তী কোন প্রশ্ন করে না। শুধু চোখের দৃষ্টিটা অপলক করে যেন একটা নাটকের রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কিছুই বলতে পারে না।

চিন্তনীয়া বলে,—দেখে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়েছে। বিশেষ

করে মেয়েদের চোখের সামনে ভদ্রলোক যেন একটা ভীরু খরগোস। সরে যাবার জন্যে ছটফট করেন। পালিয়ে যেতে পারলে আরও খুশি হন। আমি জীবনে এরকম ভাল-মানুষ কখনো দেখিনি।

জয়ন্তী কোন কথা বলে না, কিন্তু চিন্তনীয়ার খুশীর কথা ফুরোতে চায় না।—ভদ্রলোক যেন এই পৃথিবীরই মানুষ নয়। আশে পাশে কে আছে বা না আছে, কে আসছে বা চলে যাচ্ছে, কিছুই যেন ভদ্রলোকের চোখে পড়ে না। যখন জিজ্ঞাসা করলাম, দার্জিলিংয়ের অতুলবাবু কিংবা অতুলবাবুর মেয়ে জয়ন্তীকে কোনদিন দেখেছেন কিনা, তখন অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন। তোমাদের বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়ে ভদ্রলোক রোজই যান, তবু তোমাদের কাউকে চেনেন না।

জয়ন্তী—তুমি কি এখন বেড়াতে বের হয়েছ? না বেড়িয়ে ফিরছো?

চিন্তনীয়া—বেড়িয়ে ফিরছি। মাধববাবু বলেছিলেন, রোজ ভোরে তিনি টাউন থেকে একটু দূরে নিরিবিলি কোন সড়কের পাশে চুপ করে বসে থাকেন।

—কেন?

—ঘুমন্ত ফুল কেমন করে ভোরের আলোতে আস্তে আস্তে জেগে ওঠে, দেখতে খুব ভালবাসেন এই মাধববাবু। তাই…।

—কি বললে?

—তাই একবার পরীক্ষা করতে বের হয়েছিলাম। একবার সন্দেহ হয়েছিল, কথাটা একটু বাড়িয়ে বলেননি তো ভদ্রলোক। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, ঠিক। ভোরের কুয়াশার মধ্যে রাস্তার পাশে একটা নিরিবিলি কিনারায় বড় বড় ঘাসে ঘেরা একটা পাথরের কাছে বসে আছেন ভদ্রলোক। আমি কাছে যেতেই ভদ্রলোকের

যেন স্বপ্ন ভেঙে গেল। বেশ একটু রাগও করলেন বলে মনে হলো।

—কেন ?

—জানি না, কেন। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, এরকম একটু-আধটু রাগ করলেও মাধববাবু মানুষটা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন।

—কেমন করে বুঝলে ?

—মাধববাবু নিজেই অন্তত দশবার বলেছেন, আমাদের দু'জনের এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।··আচ্ছা, আমি এবার উঠি জয়ন্তী।

চলে গেল চিন্তনীয়া। কিন্তু জয়ন্তীর প্রাণটা যেন একটা ভয়াল স্তব্ধতার মধ্যে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। ভাবতে ভয় করে, সন্দেহ করলে বুক চমকে ওঠে। চিন্তনীয়ার কথাগুলিকে একটা ভয়ানক গোপন পৃথিবীর অন্ধকারের ভাষা বলে মনে হয়। চিন্তনীয়ার খোঁপাতে চোরকাঁটা ; কী ভয়ানক একটা বিভীষিকার ছবি!

না, অসম্ভব। কোন মেয়ের জীবন শত জঘন্য ভুল করলেও এমন ভয়ানক চোরকাঁটার উপর গড়াগড়ি দিতে পারে না।

কিন্তু চিন্তনীয়াকে যে সত্যিই মিথ্যে কথার একটি ফুলঝুরি বলে মনে হয়। তা না হলে মাধব মিত্রকে একটা শুদ্ধসত্ত্ব মহামান্য বলে প্রচার করতে চিন্তনীয়ার মুখের ভাষায় অত্যন্ত সামান্য একটু কুণ্ঠা থাকতো। এই মাধব মিত্র, যে লোকটা একেবারে অশিক্ষিত রক্তমাংসের একটা নির্লজ্জ লোভ হয়ে জয়ন্তীর জীবনের উপর একটা অপমানের উৎপাত ঘটাতে চেয়েছিল, সেই লোকটাকে একটা দেবতা বলে ঘোষণা করে দিয়ে গেল চিন্তনীয়া। মাধব মিত্রের ক্ষুদ্র মনুষ্যত্ব কী ভয়ানক মিথ্যা প্রচার করতে পারে ; সেটা জানা আছে জয়ন্তীর। এই মাধব মিত্রের মিথ্যে কথার কাছে কান

পেতে আর পাগল হয়ে গিয়ে মীরাটের কমলেশ জয়ন্তীকে একটা অশুচি অস্তিত্বের জঞ্জাল বলে বিশ্বাস করে ফেলেছে। কিন্তু চিন্তনীয়াও যে······।

ছটফট করে জয়ন্তীর মনের একটা দুঃসহ অস্বস্তি। চিন্তনীয়াও যে কমলেশের নামে একটা ভয়ানক অশুচি জীবনের কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে কাহিনী কি চিন্তনীয়ার মনগড়া একটা ভয়নাক মিথ্যা হতে পারে না? কমলেশ যদি হঠাৎ এসে জিজ্ঞাসা করে বসে, তুমি যদি চিন্তনীয়ার কথা বিশ্বাস কর, তবে আমি কেন মাধব মিত্রের কথা বিশ্বাস করবো না?

[পনেরো]

কাকিমার চিঠির ভাষাটা অদ্ভুত। লিখেছেন, আমি খুব অসুস্থ। তোমার কাকার শরীরও ভাল যাচ্ছে না। যদি এসময় একবার আসতে পার, তবে ভাল হয়। তা ছাড়া, অতুলবাবুরও ইচ্ছা, তুমি একবার এখানে আস।

এর মধ্যে অতুলবাবুর ইচ্ছার কথা আসে কেন? কাকিমার চিঠিটাকে দু'বার পড়বার পরেও কমলেশের মনের সন্দেহটা ভাঙেনি। অতুলবাবুর ইচ্ছের অর্থটা কি? তাঁর ফিলসফার মেয়েকে তিনি বোধহয় চিনতে পারেন নি। নিতান্ত রুক্ষ অহংকারের এক নারী। চিন্তনীয়ার মত এক সাংঘাতিক মিথ্যাবিলাসিনীর মুখ থেকে মন-গড়া অপবাদের গল্প শুনে কমলেশকে একটা অমানুষ বলে বিশ্বাস করে ফেলেছে যে, তার সঙ্গে কমলেশের জীবনের কোন সম্পর্ক যে সম্ভব নয়, এ সত্য জানেন না, বুঝতেও পারেন নি অতুলবাবু।

কিন্তু কাকিমার চিঠির অনুরোধ তুচ্ছ করতে পারেনি কমলেশ। তাই দশ দিনের ছুটি নিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছে।

দেখে খুশি হয়েছে কমলেশ, কাকিমাকে যতটা অসুস্থ বলে কল্পনা করা হয়েছিল, ঠিক ততটা অসুস্থ নন। চিন্তিত হবারও তেমন কোন কারণ নেই। আর কাকার শরীর তো সেই চিরকেলে কাশির শরীর। নতুন করে চিন্তিত হবার কিছু নেই।

তাই এখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, তুমি অতুলবাবুর কথা চিঠিতে লিখলে কেন কাকিমা? আরও একটা কথা স্পষ্ট করেই

জানতে ইচ্ছে করে—জয়ন্তী কি এর মধ্যে কোনদিনও এখানে আসে নি।

মীরাট থেকে রওনা হবার আগে কোন মুহূর্তেও কল্পনা করতে পারেনি কমলেশ যে, জয়ন্তীর কথা জানবার জন্যে, জয়ন্তীকে দেখবার জন্য মনের ভিতরে এরকম একটা তেষ্টা জেগে উঠবে।

কল্পনা করতে পারেনি কমলেশ, পথের মধ্যেই একটা স্বপ্নেরও অগোচর ঘটনা একেবারে একটা কঠিন বাস্তবতার মূর্তি ধরে দেখা দেবে। শুনতে পাওয়া গেল, ট্রেনটা কার্সিয়ং স্টেশনে প্রায় দু'ঘণ্টা থেমে থাকবে। কে জানে কেন? বোধহয় লাইনের কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে।

কার্সিয়ংয়ের ওয়েটিং রুম। অপেক্ষার কোন যাত্রী সেখানে ছিল না। শুধু কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন এক যাত্রিনী। ওয়েটিং রুমে ঢুকতেই, আর সেই যাত্রিনীকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠলো কমলেশ। সে নারী কিন্তু চমকে ওঠে না। বরং চমৎকার একটি লালচে হাসির আভা সে নারীর সারা মুখের ওপর এক ঝলক খুশির মত ছড়িয়ে পড়ে। চিন্তনীয়া বলে—চিনতে পারছেন নিশ্চয়।

কমলেশ—নিশ্চয়।

চিন্তনীয়া—আমি জানতাম, একদিন না একদিন এরকম হঠাৎ একটা দেখা হয়ে যাবে।

কমলেশ—ট্রেন এখন যাচ্ছে না; তাই বাধ্য হয়ে…।

চিন্তনীয়া—জানি, কিন্তু নিশ্চয় জানতে না যে, আমাকে এখানে দেখতে পাবে।

কমলেশ—ওসব কোন কথাই আমার মনে হয়নি।

কিন্তু কমলেশের চোখের চাহনি যেন একটা বিস্ময়ের আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে। চিন্তনীয়ার চেয়ারের পাশে মেজের কার্পেটের

উপরে রাখা আছে একটি চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগের গায়ে সাদা হরফে লেখা—মাধব মিত্র।

চিন্তনীয়া হাসে—এটা এক যাত্রী ভদ্রলোকের ব্যাগ।

কমলেশ—তার ব্যাগ আপনার কাছে কেন?

চিন্তনীয়া—আমাকে আজ হঠাৎ আপনি করে বলছো কেন!

উত্তর দেয় না কমলেশ। চিন্তনীয়া বলে,—এ ভদ্রলোক আমার চেনা। কলকাতার এক মার্চেন্ট; এখন দার্জিলিংয়েই আছে। কিন্তু অসহ্য!

কমলেশ—কি বললেন?

চিন্তনীয়া—লোকটাকে দেখলে আমার ভয় করে। কতবার অপমান করে কথা বলে দিয়েছি, তবু কাছে এসে কথা বলবে, ঘনিষ্ঠ হবার চষ্টা করবে। আমার দার্জিলিং-জীবন দুঃসহ করে তুলেছে এই লোকটা।

কমলেশকে তবু চুপ করে থাকতে দেখে চিন্তনীয়ার চোখে একটা অভিমানের ভ্রূকুটি শক্ত হয়ে ওঠে,—সব শুনেও আমার জন্যে একটা সামান্য সিমপ্যাথির কথা বলতে পারছো না।

কমলেশ হাসতে চেষ্টা করে,—দার্জিলিং ছেড়ে চলে গেলেই পারেন।

—হ্যাঁ, এবার যেতেই হবে। কিন্তু যাবার আগে লোকটাকে শুনিয়ে দিয়ে যাব যে, আমার স্বামী তোমার মত তিনটে মার্চেন্টকে চাকর রাখতে পারে।··· যাই হোক্, তুমি আবার দার্জিলিংয়ে এলে কেন? কোন কাজ আছে?

কমলেশ—না।

চিন্তনীয়া—তবে আর মিছিমিছি পুরনো দিনের একটা বাজে অভিমান মনে পুষে রেখে···।

কমলেশ—আপনি এমন কথা না বললেই ভাল করতেন।

চিন্তনীয়া—আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি। তুমি যতদিন দার্জিলিংয়ে থাকবে, ততদিন আমিও থাকবো, আর, যখনই ডাকবে তখনই····।

ঘর ছেড়ে চলে যায় কমলেশ। মনে হয়, এক নাগিনীর ফণা কমলেশের বুকে ছোবল দেবার জন্যে ছটফট করে উঠেছে। একটা বেপরোয়া লোভের বিষ কী ভয়ানক পিপাসা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ নন্দবাবু বলেন, চিন্তনীয়া কেন যেন কমলেশের নাম সহ্য করতে পারে না। চিন্তনীয়ার আপত্তির জন্যেই কমলেশকে কোনদিন চা খেতে ডাকতে পারেননি নন্দবাবু।

ফিরে গিয়ে ট্রেনের কামরার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কমলেশ। হঠাৎ কাঁধের উপর একটা হাতের স্পর্শ ঠেকতেই চমকে ওঠে। দেখতে পায়, কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে মাধব মিত্র।

—কি খবর মাধব? শুকনো স্বরে প্রশ্ন করে কমলেশ।

মাধব বলে—কোন খবর নেই। মিছিমিছি একবার ঘুম বেড়িয়ে আসবার জন্যে বের হয়েছি। দার্জিলিং আর ভাল লাগছে না।

—একাই আছ?

—হ্যাঁ, একা ছাড়া আমার তো কোন গতি হতে পারে না। সেটা তুমিও জান।

—কিন্তু এরকম একেবারে উদাসী সাধুর মত একা কেন? কোন জিনিসপত্রও তো সঙ্গে নেই।

—না; একটা ব্যাগও না। আমি এরকম একা হয়ে আর শূন্য হয়ে থাকতেই যে ভালবাসি, সেটা তো তুমি ভাল করেই জান।

কমলেশ হাসে।—না, খুব ভাল করে জানতাম না। আজ জানলাম।

মাধব—তোমার ট্রেন ছাড়তে তো অনেক দেরি আছে।

—হ্যাঁ।

—তবে কি এতক্ষণ এই কামরাতেই থাকবে?

—হ্যাঁ।

—আমিও যাই। একবার মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করে আসি। চা খাওয়াও হবে, আবার পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করাও হবে। তার আগে তো ঘুমের দিকে যাবার কোন ট্রেন নেই।

কমলেশ—কেন? ওয়েটিং রুমে থাকলেই তো পার।

মাধব—না, সম্ভব নয়।

—কেন?

—ওখানে একজন অপরিচিতা মহিলা একা বসে আছেন। কাজেই…।

ব্যস্তভাবে চলে গেল মাধব মিত্র। কমলেশের মনের ভিতরে যেন একটা কঠিন ঠাট্টার চাবুক শব্দ করে আর আছড়ে-আছড়ে পড়তে থাকে। জ্বালা বোধ করে কমলেশ, আর সেই জ্বালাটাই যেন কথা বলতে থাকে; এই হলো সেই মাধব মিত্র, যার কাছ থেকে জয়ন্তীর জীবনের গল্প শুনতে পেয়েছিল কমলেশ।

কী অদ্ভুত শান্তভাষায় কত মিথ্যে কথা বলে চলে গেল মাধব মিত্র। যে নারীর কাছে বেড়াবার জীবনের ব্যাগটি সঁপে দিয়ে এসেছে মাধব, তাকে এক অপরিচিতা মহিলা বলতে একটুও বাধলো না। মানুষের ভিতরে ও বাহিরে এমন ভয়ানক অমিল থাকতে পারে কেমন করে?

দার্জিলিংয়ে এসে যত বার কার্সিয়ং স্টেশনের ঘটনার কথা মনে পড়েছে কমলেশের, ততবার সারা মনটা যেন লজ্জায় ভরে গিয়েছে। একটা মিথ্যে অপবাদের প্রচারের কাছে কত সহজে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, যুক্তি-বুদ্ধি সবই অসহায় হয়ে যায়। মাধব মিত্রের

সেই-সব কথাকে একটু সন্দেহ করতে পারেনি, কমলেশের এই মূর্খ দুর্বলতাকে যদি কেউ ভয়ানক একরকমের চরিত্রহীনতা বলে অভিযোগ করে; তবে সেটা ভুল অভিযোগ হবে কি?

দুপুর বেলাতে ঘুমোবার অনেক চেষ্টা করেও ঘুম হলো না। বার বার শুধু মনে পড়ে, জয়ন্তী একবারও এবাড়িতে আর আসেনি। জয়ন্তী জানেও না যে, কমলেশ আবার দার্জিলিংয়ে এসেছে। জয়ন্তী এখন কল্পনাও করতে পারছে না যে, কমলেশের প্রাণটাই লজ্জা পেয়েছে। ইচ্ছে করে, এখনই একবার বের হয়ে সোজা বার্চহিল রোডের দিকে চলে যেতে; আর জয়ন্তীর কাছে গিয়ে একেবারে মুখ খুলে বলে দিতে—মাধব মিত্রের কথা বিশ্বাস করি না। মাধব যে কতবড় মিথ্যাবাদী তার প্রমাণ পেয়েছি।

সাড়া শোনা যায়; কোন আগন্তুক এসেছেন আর বাইরের ঘরে কাকার সঙ্গে কথা বলছেন। গলার স্বরটাও পরিচিত বলেই মনে হয়।

উঠে গিয়ে দেখতে পায় কমলেশ, নন্দবাবু এসেছেন। হাসছেন নন্দবাবু, আর কাকার সঙ্গে কারবারের অসুবিধার নানা কথা বলছেন।

কাকা বড় গম্ভীর। কিন্তু নন্দবাবু যেন কাকার এই গম্ভীরতাকেই হেসে হেসে ঠাট্টা করছেন।—আপনি মিথ্যে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন মনতোষদা। চিন্তনীয়া এমন বোকা নয় যে ভুল করে একটা বিপদ বা আপদে পড়ে····।

কথা শেষ না করেই, আবার কমলেশের দিকে তাকিয়ে আরও জোরে হেসে ওঠেন নন্দবাবু।—দু'দিন হলো দার্জিলিংয়ে এসেছি। কিন্তু চিন্তনীয়ার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। অসীমাদি কিছুই বলতে পারলেন না, কোথায় গিয়েছে চিন্তনীয়া। শুধু বলে

গিয়েছে, দিন চারেক পরে ফিরবে। তাই মনে হচ্ছে, আজই হয়তো ফিরবে চিন্তনীয়া। যাই হোক....।

মনতোষবাবুর চোখের চাহনিটা ক্ষুব্ধ হয়ে ধোঁয়াটে প্রদীপের মত জ্বলছে। কমলেশের চোখের তারা ছুটোও শিউরে ওঠে। কিন্তু নন্দবাবু যেন নিজের মনের সুখে বিহ্বল হয়ে চিন্তনীয়া নামে এক নারীর জীবনের প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন।—সত্যি, চিন্তনীয়ার মত নির্ভয় মনের মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। আমি বরং বলবো, দেখাই যায় না। তবে একটু ভুলো মন। সব সময় আমাকে ঠিক জানিয়ে দিয়ে যেতে পারে না, কোথায় যাচ্ছে। গত বছর কানপুর থেকে মীরাটে ফিরে অবিশ্যি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম, সাত দিনের মধ্যেও চিন্তনীয়ার কোন চিঠি পাইনি। না বলে কয়ে কোথায় চলে গেল মানুষটা ? কিন্তু ঠিক তার পরের দিনেই চিঠি পেলাম, দিল্লীতে আছে চিন্তনীয়া। চিঠিতে অন্য কোন কথা বিশেষ কিছু নেই ; শুধু আমার জন্যেই যত চিন্তা আর ভাবনা। বাস্তবিক, চিন্তনীয়ার মনটা খুবই মায়ার মন, অসম্ভব রকমের সিনসিয়ার।

মনতোষবাবু—তুমি আজ রাত্তিরে এখানেই এসে খেয়ে যেও।

নন্দবাবু—নিশ্চয়। কিন্তু যদি চিন্তনীয়া আজ এসে পড়ে ; তবে অবিশ্যি...তার মানে....চিন্তনীয়া যদি হঠাৎ কোন আপত্তি না করে, তবে নিশ্চয় আসবো।

মনতোষবাবুর ধোঁয়াটে চোখে আর একবার একটা বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কিন্তু কোন কথা বললেন না মনতোষবাবু।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান নন্দবাবু।—চলি!

নন্দবাবুর সঙ্গেই হেঁটে হেঁটে, লন পার হয়ে একেবারে ফটকের কাছে এগিয়ে আসে কমলেশ। নন্দবাবু নিজেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। বার বার কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে

এইবার যেন একটু সগর্ব ভঙ্গীতে হাসতে থাকেন নন্দবাবু।—আপনার কাছে বলতে কোন লজ্জা নেই কমলেশবাবু, আমি খুবই হ্যাপি মানুষ।

কমলেশের মাথাটা হঠাৎ হেঁট হয়ে যায়। নন্দবাবুর চোখ দুটো একটা তৃপ্তিতে বিহ্বল হয়ে ফটকের লতা-পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে।—চিন্তনীয়া আমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কি সত্যিই আমাকে সন্দেহ কর? আমি বলেছি, আমি পাগল হয়ে গেলেও তোমাকে সন্দেহ করতে পারবো না। বলুন কমলেশবাবু, খুব খাঁটি কথা বলেছি কিনা।

কমলেশের মুখ থেকে চাপা আর্তনাদের মত অদ্ভুত শব্দ করে শুধু একটা কথা গুমরে ওঠে।—হ্যাঁ।

[ষোল]

কাকিমা ডাকলেন।—কমল, তুমি কোথায়?

অন্য ঘর থেকে উত্তর দেয় কমলেশ।—এই যে, আমি এখানে।

কাকিমা—জয়ন্তী এসেছে।

চমকে ওঠে কমলেশ। কিন্তু কল্পনা করতে পারে না, অতুলবাবুর ফিলসফার মেয়ে আজ কি মনে করে, এতদিন পরে, এবাড়িতে আবার এসেছে। জয়ন্তী বোধহয় জানতো না যে, কমলেশ এখন এখানেই আছে।

কাকিমা আবার ডাকেন।—জয়ন্তী চলে যেতে চাইছে। একবার এসে দেখা করে যাও।

কমলেশ ঘরে ঢুকতেই হেসে ফেলে জয়ন্তী।—আমি জানতাম, আপনি এখানে আছেন।

কমলেশ—কেমন করে জানলেন।

জয়ন্তী—আয়াবুড়ির কাছে খবর পেয়েছি।

কমলেশ হাসে—তাই বলুন। কিন্তু নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি।

জয়ন্তী কাকিমার মুখের দিকে তাকায়।—শুনুন কাকিমা; এখনও কেমন রাগ করে কথা বলছেন মীরাটের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

কাকিমা।—না না, রাগ করে বলবে কেন? রাগ করবার কিছু নেই। কমলেশ কারও ওপর রাগ করবার মত ছেলেই নয়।

জয়ন্তী—আপনি জানেন না কাকিমা, দার্জিলিং থেকে আসার আগে বাড়ি চড়াও করে আমাকে কী ভয়ানক ধমকে আর শাসিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

কাকিমা—না না, ওসব কোন কথাই নয়। যত বাজে কথা। আচ্ছা, তোমরা এখন বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। হ্যাঁ, যাবার আগে আমাকে একবার বলে যেও, জয়ন্তী।

কমলেশের দু'চোখে যেন একটা বিস্ময় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, ঠিক বুঝতে পারছে না, বিশ্বাস করতেও পারছে না কমলেশ, কে কথা বলছে। কাকিমার কথাগুলিতে মনে হয়, যেন আজকের বিকেলের সব আলো-ছায়া একেবারে নতুন রকমের একটা রূপ ধরে নতুন ভাষায় কথা বলছে। জয়ন্তীর মুখের হাসি আর জয়ন্তীর মুখের ভাষা, দুইই যেন দুটি নতুন অভ্যর্থনা। ফিলসফি নিয়ে মাথা ঘামায়, ভালবাসার হিসেব করে, আর এক মুহূর্তের সংশয়ে সব ভেঙ্গে-চুরে দেয়, এই জয়ন্তী সেই মেয়ে নয়।

কিন্তু এই সেই ড্রইং-রুম; সেই সোফা আর কোচ। তবু ভিতরে না ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ন্তী।—আমি শুধু একটা কথা আপনার কাছে বলতে এসেছিলাম।

শুধু জয়ন্তী কেন, কমলেশও যে ওই ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা অদৃশ্য বাধা; কিন্তু ভয়ানক কঠিন বাধা।

কমলেশ—বলুন, কি বলতে চান।

জয়ন্তী—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

—একথা কেন বলছেন?

—একটা মিথ্যে গল্প শুনে আর সে-গল্প বিশ্বাস করে আপনার মত মানুষকে সন্দেহ করেছি।

—আমিও তো ঠিক এইরকম কীর্তি করেছি। বাজে লোকের মুখ থেকে শোনা একটা মিথ্যে গল্পকে বিশ্বাস করে আপনাকে…।

জয়ন্তী করুণভাবে হাসে।—সত্যিই, কি যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

কমলেশ—আমারও আজ বিশ্রী একটা অস্বস্তি; তার মানে বেশ একটু লজ্জা বোধ করতে হচ্ছে যে····।

জয়ন্তী—থাক্, আর এসব কথা তুলে লাভ নেই। কবে মীরাট ফিরে যাচ্ছেন?

—ধরুন, আর দিন তিন-চারের মধ্যেই।

এরপর আর কি কথা হতে পারে, আর কি বলবারই বা আছে? জয়ন্তী শুধু চুপ করে বারান্দার টবের অর্কিডের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কমলেশ দেখতে পায়, বিকেলের আলো মইয়ে আসছে! ভালবাসার বাধা জয় করতে এসে দু'জনে এখনও যেন অলস হয়ে আছে। নিশ্বাসের বাতাসে ব্যস্ততা নেই; চোখের চাহনিতে কোন ব্যাকুলতা দুরন্ত হয়ে ওঠে না।

কী আশ্চর্য, যেদিন দু'জনের মধ্যে চেনা-শুনা কোন সম্পর্কের সামান্য বন্ধনও ছিল না, সেদিন খাজুরাহোর সেই মন্দিরের একটি নিভৃতে, যুগল পাথুরে মূর্তির আলিঙ্গনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে যে-দুজনের মনে কোন বাধা ছিল না, আজ তারা এভাবে এত কাছাকাছি হয়েও এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, চলে যেতে চাইছে জয়ন্তী। কমলেশও বুঝতে পারে না, আর এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কী লাভ আছে।

না, জয়ন্তীর মনে আর কোন ভয় নেই। চিন্তনীয়া যে-সব ভয়ানক কথা বলেছে, সেগুলি সবই নিতান্ত মিথ্যা। আজ আর এ সত্য বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই। কমলেশের জীবনে কোন খুঁত নেই, কোন ভয়ানক ক্ষতচিহ্ন নেই।

কমলেশও বুঝেছে, মাধব মিত্রের মুখের সেই ভয়ানক গল্প, মিথ্যেবাদীর একটা মনগড়া অপবাদের গল্প মাত্র। জয়ন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, নিখুঁত জীবনের একটি

মেয়ের সুন্দর মুখটা ভোরের ফুলের মত ফুটে রয়েছে। কোন ক্ষত নেই, থাকতেও পারে না।

বোধহয় বুঝতে পারেনি জয়ন্তী আর কমলেশ, বিকেলের শেষ আলো ফুরিয়ে গিয়ে কখন সন্ধ্যার প্রথম আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে।

ফটক পার হয়ে কে যেন এবাড়ির এই ঘরেরই বারান্দার দিকে আসছে। জয়ন্তী ব্যস্তভাবে বলে—এবার আমি যাই।

বারান্দায় দেয়ালের সুইচ টিপে আলো জ্বালে কমলেশ।—সত্যিই যাবেন?

জয়ন্তী—হ্যাঁ।

আগন্তুকের মূর্তি একেবারে বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কমলেশের চোখের দৃষ্টি চমকে ওঠবার আগেই আগন্তুকের মুখে যেন একটা দুরন্ত বিস্ময়ের শব্দ বেজে ওঠে।—এ কি? জয়ন্তী এখানে কি মনে করে? কতক্ষণ?

জয়ন্তী—অনেকক্ষণ। কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

চিন্তনীয়া—আমিও তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। কিন্তু ভাবতে পারিনি, তোমাকে এখানে দেখতে পাব।

জয়ন্তী—নন্দবাবু কাল আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

চিন্তনীয়া—কেন?

জয়ন্তী—এমনই।

চিন্তনীয়া বারান্দার উপরে উঠে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।—ভাল কথা। কিন্তু মনে হচ্ছে, কমলেশবাবু আমাকে চিনতে পারছেন না।

কমলেশ হাসতে চেষ্টা করে।—না চেনবার তো কোন কারণ নেই।

চিন্তনীয়া—তবু তো নিজের থেকে একটা কথা বললেন না।

কমলেশ—বলতাম নিশ্চয়।

চিন্তনীয়া অদ্ভুত ভাবে হাসে,—না, বলতেন না। কিন্তু আজ পাটনার মেয়ে মানসীর সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় চুপ করে থাকতে পারতেন না।

কমলেশের দুই চোখ তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে, কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন উদাস হয়ে যায়। চিন্তনীয়াকে পাল্টা কোন কথা বলে জবাব দেবার মত কোন ভাষা, কোন যুক্তি আর কোন জোর নেই আজকের এই কমলেশের।

জয়ন্তী শুধু অপলক চোখ তুলে কমলেশের এই উদাস মূর্তিটাকে দেখতে থাকে। তার পরেই বলে—আমি চলি কমলেশবাবু।

চিন্তনীয়া হেসে ওঠে,—কোথায় যাবে জয়ন্তী? বাড়ীতে?

জয়ন্তী—হ্যাঁ।

চিন্তনীয়া হাসে—বেশ তো সেজন্যে এত ব্যস্ত কেন? তোমার ব্যস্ততা এখন বোধ হয় কলকাতায় আছেন।

জয়ন্তী চকিতে একবার চিন্তনীয়ার এই ভয়ানক হাসিমুখর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়েই মাথা হেঁট করে।

চিন্তনীয়া বলে—সলিল বাবু এখন কলকাতাতেই আছেন বলে শুনেছি।

বারান্দার চেয়ারের উপরে বসে পড়ে হাসতে থাকে চিন্তনীয়া। —এইবার কমলেশবাবুর কাকিমার কাছে দু'মিনিট কথা বলে নিয়েই চলে যাব।

জয়ন্তী বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। যেন চতুর ও হিংস্র একটা পরাভবের কাছে মাথা হেঁট করে এইবার সরে যেতে চাইছে জয়ন্তী। না যেয়ে উপায় নেই। মিথ্যে কথার চিন্তনীয়াকে এইবার নিতান্ত একটা সত্য কথা বলে দিয়েছে। কিন্তু কমলেশ

যেন একটা কঠোর আক্রোশের ঝড়ের মত এগিয়ে যেয়ে জয়ন্তীর পথ আটক করে,—কোথায় যাচ্ছো ?

জয়ন্তীর চোখের দৃষ্টি থরথর করে কাঁপছে,—চিন্তনীয়ার কথা শুনলে তো ?

কমলেশ—শুনেছি।

জয়ন্তী—মিথ্যে কথা বলেনি চিন্তনীয়া।

কমলেশ—নিশ্চয় মিথ্যে কথা।

জয়ন্তী—না।

কমলেশ—হোক্ সত্যি কথা ; কিন্তু একেবারে বাজে কথা।

চিন্তনীয়া হেসে ওঠে।—কিন্তু জয়ন্তী বেচারা কি বিশ্বাস করতে পারছে যে, কমলেশবাবুর সেই মানসীও একটা মিথ্যে কথা ?

চিন্তনীয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে জয়ন্তী—মিথ্যে কথা না হোক্, একেবারে বাজে কথা।

চিন্তনীয়া হাসতে থাকে, কিন্তু হাসির শব্দটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আর দুই চোখ বড় করে দেখতে থাকে চিন্তনীয়া, জয়ন্তীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে ড্রইং রুমের বিশ্রী অন্ধকারের ভিতরে চলে গেল কমলেশ।